গীটারে লঘুস্থর

শ্রীনিশীথচাঁদ মিত্র

প্রাপ্তিস্থান
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৬২

প্রকাশক
শ্রীমতী প্রীতিরেখা মিত্র
৬, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

কাকাকে দিলাম

নিশীথ

অল্প করে টক মিষ্টি ঝাল নুন দিয়ে কয়েকটা হাল্কা কোর্স পরিবেশন করে যাঁদের রুচ্যর্থে দিতেছি সেই প্রীতিভাজন শ্রীমানেরা যদি তারিয়ে তারিয়ে চেখে বলেন—চলতে পারে—তাহ'লেই যথেষ্ট; নতুবা আমারই চতুর্থী হওয়া উচিত বুঝব। ইতি

লেখক

সূচীপত্র

গীটারে লঘুস্বর	...	১
নির্ঝঞ্ঝাট ভদ্রমহিলা চাই	...	৩
"সান্ধ্য সম্মেলনে"র সান্ধ্য সম্মেলন	...	৬
সকাল ন'টা থেকে দশটা	...	১০
হিয়ারসে এভিডেন্স	...	১৩
কলেজ বন্ধ হয়ে গেল	...	১৬
একটা দাঁত নড়ছিল কিন্তু পড়ছিল না	...	১৮
সন্ধ্যা সমাগতা	...	২০
হরিশবাবু আমার টাইপবাবু	...	২৩
বড় বাড়ির ছোট বৌ	...	২৫
তারানাথ মারা গেল	...	২৯
প্রবীণ নবীনবাবু সদাহাস্যময়	...	৩২
পর পর তিনটে শনিবার	...	৩৪
ডক্টর ইন্দ্রনীল চৌধুরী সিগার ধরালেন	...	৩৬
ট্রাম অনেকক্ষণ থেমেছিল	...	৪০
ডাবলিউ ডাবলিউ কে ফ্র্যাংকলীন	...	৪৩
কেবল রবিবারেই বাজার যাই	...	৪৬
উয়াঁ, উয়াঁ, উয়াঁ	...	৪৮
লেন সরু, বাইলেন আরও সরু	...	৫১
বড় সাহেবের স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে	...	৫৪
ভাল কাজে কত বাধা	...	৫৭
কুণালকুমার নায়ক আর বকুলমালা নায়িকা	...	৬০
ভরেন বাবু নরেন বাবু, বরেন বাবু আর হরেন বাবু	...	৬৫
শ্রী মতি বক্সী ও শ্রীমতি বক্সী	...	৬৭
ঘণ্টা পড়ে গেছে অনেকক্ষণ	...	৬৯
ছুটির দিনে দুপুর বেলা	...	৭১
বিদগ্ধ মধ্যাহ্নের বন্ধ্যা সরণি	...	৭৩

কুমার কুমার কুমার অফ কুমারগাছি	...	৭৫
চিঠির পরেই চিঠি	...	৮৪
রণেনবাবুর আজ অফিস নেই	...	৮৬
তিরিশ বছর পরে একঘণ্টা	...	৮৭
প্রতি রবিবারে চতুষ্পদের আড্ডা	...	৯১
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন	...	৯৩
রাত্রি দশটা বেজে গেছে	...	৯৪
ও বাড়িতে রেডিয়োয় গান হচ্ছিল	...	৯৫
পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে	...	৯৬
ভদ্রলোককে দেখিনি, চিনি না	...	৯৭
ছুটির দিনে সকাল বেলা	...	৯৯
ট্রাম স্টপেজে দেখা হল	...	১০১
রক্তাল্পতায় ভুগিতেছিলাম	...	১০২
শ্রীলেখার বিবাহ সম্প্রতি হয়েছে	...	১০৪
নিয়তি আপীলকারিণী, বিধাতা বিচারক	...	১০৫
শিববাবুকে ডাকতে গিয়েছিলাম	...	১১১
ছুটির দিনে বিশ্রম্ভালাপ	...	১১৩
পাশাপাশি দুজনের অফিস	...	১১৪
সরল খস খস ক'রে লিখে যাচ্ছিল	...	১১৫
পরিবার পরিকল্পনা	...	১১৭
মাত্র দু দিনের ব্যবধান	...	১১৯
পথে যেতে যেতে দেখি	...	১২০
বর্ষায় তেলেভাজা অমৃত সমান	...	১২১
ঘোর ঘোটের কলা	...	১২২

·গীটারে লঘুস্বর।

কত মিষ্টি জিনিস—কিন্তু এটাই আমার কাল হল।

পাত্র গোবিন্দপুরের স্টেশন-মাস্টার—ফটোর সিলেকসনে নিশ্চয়ই উৎরে গেছি, নতুবা ইণ্টারভিউ নিতে পাত্রপক্ষ এলেনই বা কেন?

প্রথমজন সন্দেশ ভাঙতে ভাঙতে প্রশ্ন করেন, সংস্কৃতে যখন এম. এ. তখন কুমারসম্ভব স্বপ্নবাসবদত্তা মেঘদূত পড়া আছে তো বটেই। মেঘদূত থেকে একটা আবৃত্তি করুন তো শুনি। আস্তে আস্তে করবেন, বেশ দরদ দিয়ে।

আমি যখন ধীরে ধীরে আবৃত্তি করে মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করি, শ্রোতা তখন ঊর্ধ্বমুখ হয়ে ক্যালেণ্ডারে হিংস্রতার প্রতীক নরখাদক বাঘের ছবি দেখতে থাকেন।

দ্বিতীয়জন কফির পেয়ালা হাতে করে বলেন, মোটামুটি রান্নাবান্না জানা আছে তো নিশ্চয়ই—যেমন স্বক্তো, মোচার ঘণ্ট, ধোঁকা, বিরিয়ানি, তন্দুরী, মুর্গিমসাল্লাম—এই আর কি। তা হলেই যথেষ্ট।

মিষ্টি হাসি হেসে উত্তর দিই, গেরস্ত-বাড়ির সাদামাটা রান্না মার কাছে শিখেছি।

তৃতীয়জন চামচ দিয়ে রাজভোগ কেটে বলেন, গান বাজনা? যেমন রবীন্দ্র-সঙ্গীত, অতুলপ্রসাদী, নজরুল-গীতি, রামপ্রসাদী, দেশাত্মবোধক? গলা তো ভালই মনে হচ্ছে—হোক না দু-একখানা। মন্দ কি?

তিনরকমের তিনখানা গান গেয়ে তৃপ্তি দিতে হল। উঠতে যাব, শেষ প্রশ্ন হল, ইলেকট্রিক গীটারে লঘু সঙ্গীতের স্বর তুলতে পারেন?

বনো, ধরেছিস তো ঠিক। ওটা তো একদম জেনে নেওয়া হয়নি। তোর তো আবার ঐ দিকেই টেস্ট? তাই না?

তিনজনের যুগপৎ প্রশ্ন: পারেন? গীটারে? লঘু স্বর?

শ্যামকান্তি মেদবহুল বনমালীটি যে কে বুঝতে দেরী হয়নি—সবার শেষে যেন সেরা প্রশ্নটি করেছেন স্মিত হাস্যে এরূপ ভাবটি মুখে ফুটল। ঝানু ব্যারিস্টার তুখোড় সাক্ষীকে একটি প্রশ্নেই ঘায়েল করে দেবেন—এইরূপই তাঁর মুখের প্রতিচ্ছবি।

পরক্ষণেই দাঁড়িয়ে উঠে কাপড়ের খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলি, স্টেশন-মাস্টারবাবুর সংসারে ঘরকন্নার যাবতীয় কাজ করে রেঁধেবেড়ে জল তুলে বাটনা বেটে বছর বছর ছেলেমেয়ে পেটে ধরে পড়িয়ে শিখিয়ে মানুষ করে পতিদেবতাকে তৃপ্ত করে মেঘদূত শুনিয়ে মুর্গিমসাল্লাম খাইয়ে ভক্তিমূলক গান গেয়ে ইলেকট্রিক গীটারে লঘু সঙ্গীতের সুর তোলবার সময় পাব কি?

এ সম্বন্ধটিও ভেঙে গেল। পাত্রপক্ষ ফিরে গিয়ে জবাব দিয়েছেন আর সব তো একরকম চলনসই গোছের তবে মেয়েটি বড় মুখরা বলে আমাদের পছন্দ হয়নি।

পাত্রপক্ষের চিঠি পেয়ে বাবা যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করলেন।

মুখরা মেয়ের মতনই তাঁকে বোঝাই, ইলেকট্রিক গীটারের প্রসঙ্গে মাথা হেলালেই তো বেশ কিছু খরচা বাড়ত। পরিবর্তে লাভটা হত কি? গীটারের বাক্সের ওপরে তো ঘুঁটের ঝুড়ি বা পুরনো কাগজের গাদা বসত আর ছ মাস ন মাসে ধুলোবালি ঝেড়েপুঁছে রাখতে আমারই গতর খসত নতুবা অহর্নিশি শোনা যেত—বাপের শখকে বলিহারি—দেওয়ার তো আর জিনিস পেলে না ভূ-ভারতে—বিদুষী মেয়ে—দুম্ করে এক বাক্সি যন্তর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, এটুকু বাসায় রাখি কোথায়—কেন ঐ টাকাটা কি ধরে দেওয়া যেত না? বলো সুবিধামত যা হোক কিছু পছন্দগোছের কিনতো।

॥ ২ ॥

নির্ঝঞ্ঝাট ভদ্রমহিলা চাই—

এই বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম এই আমার অপরাধ। কেন দিয়েছিলাম পরে বলছি।

তিনজনের ইণ্টারভিউয়ের পরে চতুর্থ বারে মিসেস চক্রবর্তীকে মনোনীতও যে করেছিলাম এটাও সত্য কেন না প্রথমে যিনি এলেন, তিনি ভদ্রও বটে মহিলাও বটে তবে নির্ঝঞ্ঝাট নন—চারটি ছেলে একটি মেয়ে রোগা স্বামী ও নিজেকে নিয়ে সাতটি পেট চালাতে একা স্বামীর আয়ে কুলোয় না। তাও স্বামী যেখানে কাজ করেন সেখানে নাকি নো ওয়ার্ক নো পে। কোন মাসেই নাকি তিরিশ দিনের মাইনে হাতে আসে না।

দ্বিতীয়জনকে দেখলাম নির্ঝঞ্ঝাট ও মহিলা বটে কিন্তু তাঁর বেশভূষা কথা-বার্তায় শালীনতার লেশ মাত্র নেই। ভদ্র বলি কি করে?

তৃতীয়জন যে নির্ঝঞ্ঝাট ও ভদ্র সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তিনি মহিলা নন, পুরুষমানুষ। যুক্তি দিয়ে বোঝালেন একই মাইনেয় কোন মহিলা অপেক্ষা কোন পুরুষের কাছ থেকে যদি বেশী কাজ পাওয়া যায় তবে রাখব না কেন। তাঁর আরগুমেণ্ট আমার কাছে গ্রহণযোগ্য হল না।

দুটি শিশুর দেখাশোনা, বাড়ির রান্নাবান্না ও সংসারের কাজের জন্য মধ্য-বয়সী নির্ঝঞ্ঝাট ভদ্রমহিলা চাই বিজ্ঞাপনে পরিষ্কার বলা ছিল—

বৃদ্ধা মাতা রুগ্না স্ত্রী ও দুটি শিশুকন্যাকে লইয়া আমার সংসার—নৈহাটিতে থাকি, প্রোফেসারী করি কলকাতায়। টিউশানী করিয়া বাড়ি ফিরিতে বেশ রাতই হয়।

ঘরের ও বাইরের কাজ করবার মতন দ্বিতীয় প্রাণী বাড়িতে নেই বলে সংসারতরণীকে ঠিকভাবে চালাতে আমাকে সম্পূর্ণভাবে বেকার থাকতে হয়—কিন্তু তাতে দক্ষিণহস্তের ব্যবস্থা কি করে চলে?

প্রমীলা সংসারে মহিলাই একমাত্র নিরাপদ এই ভেবেই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম।

আধাবয়সী মিসেস চক্রবর্তী এসে কথা বলে গেলেন—ঠিক হল আগামী

রবিবার পয়লা থেকে কাজে লাগবেন। তিনি যে ভদ্রঘরের মহিলা তা তাঁর চেহারায় ও কথাবার্তায় মালুম পাওয়া গেল। পরিচয়পত্র দু-তিনজনের যা দেখালেন আমি তাঁদের চিনতে পারলাম না। আরও পরিচয় দিলেন —একদা বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ ঘরের নিঃসন্তান বিধবা মহিলা মিসেস চক্রবর্তী ভদ্র পরিবারে থেকে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্যই চেষ্টা করছেন—চলনসই গোছের লেখাপড়াও জানেন—ভদ্রোচিত ব্যবহারই তাঁর মুখ্য কাম্য, মাইনে কম-বেশীতে কিছু এসে-যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে একথাও শোনাতে ভুললেন না যে দেওঘরের সাহুবাবুরা নাকি দুশো টাকা মাইনে দিয়ে তাঁকে নিয়ে যেতে সাধাসাধি করছে। ও পক্ষ তাঁর আজীবন ভার নিতে চান, এ পক্ষ রাজী নন। একে বিদেশ-বিভূঁই তায় একলা মানুষ, কি করে রাজী হওয়া যায়।

আমার এখানে কাজ ঠিক হল এই অর্থে যদি এক লাইন লিখে দিই তো তিনি তা সাহুবাবুদের পাঠিয়ে দিলে সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না।

বিশ্বাস করে মিসেস চক্রবর্তীর কথামত লিখে কাগজটি তাঁর হাতে দিলাম। নমস্কারান্তে তিনি তখনকার মতন বিদায় হলেন।

রবিবার সকাল বেলার দিকে মিসেস চক্রবর্তীর আগমনে কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হলাম।

পাঁচ বছরের টুনী আমার বড় মেয়ে—পাশেই ছিল; দেখে বলল, ওমা, এ যে শৈলেনের দিদি গো! এ আবার কোত্থেকে এসে জুটল!

কাগজ থেকে মুখ তুলে বললাম, শৈলেন কে আবার? উত্তর হল, দর্জিপাড়ায় তাদের মামার বাড়িতে দুধ দেয় শৈলেন ঘোষ, গোয়ালা। গরু কিনবে বলে মামার কাছে টাকা নিয়ে ভেগেছিল—সে অনেক টাকা; ভীষণ চোর লোকটা।

বৃদ্ধা মাতা বললেন, কোথাকার কাকে ঠিক করলি বুঝি না। কি জাতের, কেমন লোক, জানা নেই শোনা নেই। বামুনের বাড়ি, ঘরে নারায়ণ রয়েছেন।

ছোট মেয়ে বলল, আমাদের ও কে হয় বাপি? কি বলে ডাকব আমরা?

অবশেষে স্ত্রী সুরমা বেশ চেঁচিয়েই তাঁর রায় দিলেন, এখনও তো টেঁসে যাইনি, এর ভেতরেই তলে তলে এতদূর গড়িয়েছে?

মিনিট দশেক প্রস্তরবৎ বসে রইলাম।

ভদ্রমহিলাকে পরে বললাম, আপনি বরঞ্চ আজ আসুন। ঠিকানা তো

রইলই, আমি জানাবোখন। এই নিন ট্রেন ভাড়াটা।—বলে পাঁচটি টাকা দিলাম।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। মিসেস চক্রবর্তী বললেন, ক্ষ্যামতাই যদি নেই তো এত শখ সাধ কেন? পুরুষে ঘেন্না। এবার থেকে হাতে চুড়ি পরে থাকুন।

জীবনে কতশত পাতায় দাগ দিয়ে দিয়ে পড়েছি, আমার জীবনের পাতায় এই বোধ হয় প্রথম দাগ পড়ল।

মিসেস চক্রবর্তীটি যে কতখানি নির্ঝঞ্ঝাট ভদ্রমহিলা পরে বুঝেছি। তিনি অভদ্র ভাষায় আমাকে উকীলের চিঠি দিয়ে আড়াই হাজার টাকার খেসারৎ চেয়ে আমাকে মহাঝঞ্ঝাটে ফেললেন। আমাকে পশুর সঙ্গে তুলনা করে কুপ্রস্তাবের মিথ্যা অপবাদের কথাও বাদ দেননি। তাঁর সঙ্গে আপোস-রফা করতে আমার বেশ কিছু অর্থনাশ হল। বাড়িতেও শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে মন্দ খসল না।

তথাপি, আমার জীবনের পাতার দাগটা বেমালুম বোধহয় উঠল না।

"সান্ধ্য সম্মেলনে"র সান্ধ্য সম্মেলন।

মাখন দাঁত দিয়ে নখ কাটছিল; বলল, সে বিয়ে কোনদিন যদি করি মাইরি তো দেখে নিস সে বিউটি কাকে বলে। জল খেলে গলা দিয়ে সেই জল পাস করছে দেখতে পাবি। সেজবৌদির বোন জোনাকীকে সেদিন তোদের দেখালুম তো, সেদিন সেই যে মার্কেটে, তোরা বললি মাথা ঘুরে যাচ্ছে। তা ভাব্, সে যদি জোনাকী হয় তো আমার বৌ হবে চাঁদের আলো। এই এত বড একটা হীরের মতন চেকনাই দেবে—দেখে নিস তোরা।

বাকী সভ্যবৃন্দ বলল, হিয়ার হিয়ার।

ভটচায বলল, ছুটো ডায়মণ্ড—হ্যাঁ, কি বললি রে মাখনা? রূপ? রূপ নিয়ে ধুয়ে খা। ওটা হচ্ছে স্রেফ সাময়িক একটা কি বলব—একটা মোহ—মানে একটা মরীচিকা গোছের। টিঁকবে বছর খানেক, কি বড় জোর ছু বছর—তার পরেই ফক্কা। একটা বড়লোক, নামটা এখন মনে পড়ছে না—কি বলেছিল জানিস? বলেছিল বইই বল আর বউই বল পুরনো হয়ে গেলে ও ছুইই সমান। কোথায়ই বা থাকবে তোমার সেই সোনার জলের লেখা আর কোথাই বা থাকবে তোমার মানে তার মানে সেই বউটার আঁটসাঁট বাঁধুনী। আমি বুঝি বাবা প্লেন কথা—এ গার্ল এবং দি চেক। এ প্রিন্সেস এবং দি কিংডাম।

বাকী সভ্যরা বলল, দি আইডিয়া।

তিমু খবরের কাগজ পড়ছিল—মুখ না তুলেই বলল, ননসেন্স, বৌয়ের রূপ আর বিয়েতে রূপো ছুটোই এখন ব্যাক্‌ডেটেড্—বিগত সেঞ্চুরীর—এখন হচ্ছে বি আপ টু টুমরো। তিনটি লাইন লিখলে পাঁচটা বানান ভুল আজকালকার দিনে আর চলে না; হোয়াট আই মিন, কিছু ছাপটাপ থাকতেই হবে তবে কিনা বয়সের সঙ্গে ওটা ভ্যারি করবে—ছোট মেয়ে নাও—একটা ছাপ, আর একটু বড়—ছুটো ছাপ, বয়স যদি একটু বেশী গড়িয়ে যায় টেক এ বি এ, এম এ বিটি, এল্ এল্ বি, যা খুশি—মোদ্দা কথা ও জিনিসটা এসেন্‌সিয়াল্।

বাকী সভ্যরা বলল, মাস্ট্ বি—

গোষ্ঠ কাশছিল, বলল, ফোর ইন্ নো ট্রাম্পস্—বলে খানিকটা কেশে

আরম্ভ করল, দ্যাখ্, আমি যখন বিয়ে করব আমার বৌয়ের মধ্যে থাকবে স্মার্টনেশ্, থাকবে স্বাস্থ্য আর থাকবে চঞ্চলতা। স্কিপিং রানিং জাম্পিং রোয়িং অ্যাণ্ড সুইমিং। তা না হলে কি হয় জানিস? একটা কি দুটো ডিভিডেণ্ড ডিক্লেয়ার করার পরেই বোতল বোতল ভাইব্রোণা আর বোণব্রোণা—আই হেট্ ইট্। বৌকে দেখাচ্ছে ফর্সা কিন্তু তিনি হচ্ছেন এনিমিক্—এ তো হচ্ছে নট্ ওন্‌লি অচল বাট্ অল্‌সো অধম।

বাকী সভ্যরা বলল, ও ডেফিনাইট্‌লি।

মোটা কুঞ্জলাল শিস্ দিয়ে ঈষৎ দুলে দুলে বোঝাচ্ছিল—ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে, আমি বনফুল গো—বলল, সবার সেরা আমি বলব কলা বিদ্যা—দি ফাইন আর্টস্—আরও পরিষ্কার করে বলি শোন, এই ধর যেমন ধ্রুপদে ফার্স্ট খেয়ালে ফার্স্ট ঠুংরীতে ফার্স্ট গজলে ফার্স্ট ভজনে ফার্স্ট বাউলে ফার্স্ট কীর্তনে ফার্স্ট মডার্ণে ফার্স্ট রামপ্রসাদী ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ফার্স্ট, এখন আবার জাতীয় সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক তাতেও ফার্স্ট। তারপর ধর এই যেমন গীটার সেতার এস্রাজ ম্যাণ্ডোলীন ফ্লুট আর বাঁশের বাঁশী। তারপর এই ধর যেমন নৃত্য, পৌরাণিক থেকে আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় নৃত্যে সত্য ও অকাট্য আভিজাত্যের যেন ইয়ে অর্থাৎ ঐক্য বাক্য ও মাণিক্য অর্থাৎ কিনা একেবারে গোড়ার কথা।

বাকী সভ্যরা বলল, কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ, যুগযুগ জিয়ো বেটা।

আমি তখন সম্প্রতি বিয়ে করেছি। পত্নীপ্রীতিতেই নিজের বৌয়ের খুঁতের কথা ভাবিনি।

নিঃশব্দে দাবার ছকে বড়েটাকে এক ঘর ঠেলে দিলাম।

বছর পাঁচেক পরের কথা। ভারত সরকারের চাকরিতে বদলী হয়ে দিল্লী চলে গিয়েছিলাম। হপ্তা খানেক হল পুনঃবদলী হয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছি। এসে দেখি বাড়ি থেকে সান্ধ্য সম্মেলন লোপ পেয়েছে—সেই ঘরে জাঁকিয়ে বসেছে এক রঞ্জনিকা ছাপা শাড়ির দোকান।

দাদা বললেন, বাঙালীর কিছুই টেঁকে না, তায় আবার ক্লাব। একটা ভাল চান্স পেয়ে গেলাম, দিলাম বসিয়ে। এস্টেটের যা হোক কিছু ইনকামও তো হবে। খরচ দিন দিন বাড়ছে না কমছে বলতে পারিস? বুঝিস তো সব।

আমি বুঝলেও আমার মন বোঝেনি ; বিয়োগ-বেদনায় ব্যথাতুর ছিলাম।

দাদা নাকি সেলামীর মোটা টাকা পেয়েছিলেন, পরে শুনতে পাই। ক্লাবটি উঠে যাওয়াতে শাপে বর হয়েছিল।

সেদিন সেকেণ্ড স্যাটারডে ছিল, তাড়াহুড়োর নামগন্ধ নেই। সকালে বাজার যাব, বাড়ির সামনে হঠাৎ মাখনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আবেগে জড়িয়ে ধরে বাড়িতে আনলাম, চা এক কাপ খাওয়ালাম, প্রাণ খুলে গল্প করে যেন বাঁচলাম—দীর্ঘ বিচ্ছেদান্তে পুনর্মিলন ঘনান্ধকারে শিবদীপ দর্শনের মতন। এ কথা সে কথা নানা কথা হল। বললাম, হ্যাঁ রে ভটচায্, তিনু, গোষ্ঠ, কুঞ্জ এদের সব খবর কি ? ক্লাবটা তুলে দিলি ? কেন রে ?

সিগারেটের শেষ সিকি ইঞ্চিটুকু অবজ্ঞাভরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মাখন বলল, সে না তুলে দিয়ে উপায় কি বল্—কেউ গেলেন বেহালায়, কেউ গেলেন দমদমায়, কেউ গেলেন গিরিডি—আর তুই তো একেবারে ক্যাপিটালে। ক্লাবটা করবে কে ? ভূতে ?

বললাম, কি রকম ? কে কি করে এখন ? ভটচায্ করে কি ?

মাখন বলল, কি আর করবে—বিয়ে করলে এক স্কুলমাস্টারের মেয়েকে। বিয়ের পরেই শ্বশুর মারা গেলেন, দিয়ে গেলেন শাশুড়ী, দিদিশাশুড়ী, বাচ্চা একটা শালা, তিন তিনটে শালী জামাইয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে। এখানে বেশী ভাড়া গুঁজতে পারলে না—বেহালায় উঠে গেল—সেখানেই একটা ফ্যাক্টরীতে চাকরি করছে আর শ্বশুরবাড়ির গুষ্টি পুষছে।

বললাম, তাই নাকি ? আর তিনু ?

মাখন বলল, সে এখানেই আছে। বিয়ে করেছে, ছুতার পাড়া লেনে থাকে। খায়দায়, অফিস করে আর বাড়ি ফিরে খিচিরখিচির সর্বক্ষণ। আর সে জরুটাও হয়েছে তেমনি গরু। ধোপাকে দশখানা কাপড় দিয়ে খাতায় লেখে সাতখানা, ঝিকে দুটো টাকা দিতে হলে দিয়ে দেয় সাড়ে তিন টাকা। সে কেমনতর যেন মাইরি, চলে না—হাড়েনাড়ে জ্বলছে তিনু। কম দুঃখু করে! বেচারা!

বললাম, বটে! আর গোষ্ঠ ?

মাখন বললে, সে এখানে কোথা ? সে তো এখন গিরিডিতে। বিয়ে-থা করলে, পরে ধরা পড়ল বৌয়ের একটা খারাপ অসুখ ছিল। এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তিনি শয্যা নিলেন। আজ এখানে কাল সেখানে এই করে বেড়াচ্ছে গোষ্ঠ। ডাক্তার কোবরেজ ওষুধপত্তর পথ্যি চেঞ্জ সে এক ঝঞ্ঝাট কি বাত। সে এখন

গিরিডিতে গেছে হাওয়া খাওয়াতে। গোষ্ঠ বলেই সে পারলে, বাপের টু পাইস আছে তো।

বললাম, তা সত্যি। আর কুঞ্জলাল?

মাখন বলল, কুঞ্জলাল দি ঘরজামাই। তবে শোন্, বিয়ে করেছে শ্বশুরের ওন্‌লি মেয়েকে। বউটা কিন্তু একটু হাবাবোবা গোছের, প্লাস পায়েরও দোষ আছে, একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। একেবারে যে কথা বলতে পারে না তা নয়—তবে সে না বলারই সামিল। শ্বশুর দমদমায় একটা বাড়ি করে দিয়েছে। জামাই শ্বশুরের বিষয়টিষয় দেখাশুনা করে—আর খায়দায়, থাকে। ছুটি ছেলে ছুটি মেয়ে—ছুবারই টুইন পয়দা।

বললাম, তা বেশ, আর কি খবর বল্?

মাখন বলল, সে আজ চলি মাইরি, আবার অফিস যেতে হবে, দেরী হয়ে যাবে।

বললাম, তা তুই কি করছিস বললি না তো?

মাখন বলল, সে একটা চাকরি করছি মাইরি। ফিন্‌লে অ্যাণ্ড মারের অফিসে আমেরিকান কোলাবোরেশন। সে মন্দ নয়, মাইনে ভালই দেয়—যে বোনাস গত বছরও দিয়েছে—নট্ ব্যাড্—তা ছাড়াএদিক ওদিকেও কিছু হয়—ট্রাম্ফ কার্ড তো হাতেই—মানে আর কি, বড়বাবু—জামাইকে করবে না তো কাকে করবে বল্?

বললাম, তাই নাকি? কি আশ্চর্য! বিয়ে করেছিস তো এতক্ষণ বলিস-নি কেন? তা বউটি হল কেমন? নিশ্চয়ই বেদাগী কমল হীরে একটা?

মাখন বলল, দূর বোকা, সে সব সুবিধা কি আর হয় রে? বউটা হয়েছে মাইরি মোটাসোটা গোলগাল কালো-কোলো বেঁটে-খাটো গোছের মেয়েমানুষ একটা। লাইক ফাদার লাইক ডটার, হুবহু। অধিকন্তু শ্বশুর মশায়ের চেয়েও আরও একটু বেশী কোয়ালিফায়েড—কেন না শ্বশুর মশায় ট্যারা নন, বউটা আবার একটু ট্যারা। আমার দিকে চেয়ে হাসতে থাকলেও মনে হয় যেন আর কারোর দিকে চেয়ে হাসছে।

নির্লিপ্ত ভাবেই বললাম, বলিস কিরে? মাখনের বৌ পরকীয়া বলে তার সম্বন্ধে কোন কথা জানবার আগ্রহ দেখালাম না। এবারে কিন্তু পত্নীপ্রীতিতে নয় পত্নীভীতিতেই। আমার পত্নী তখন দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাজার আনতে দেরী হচ্ছে—উনুন কামাই যাচ্ছে—চোখের ভুরু বেঁকে যাচ্ছে।

॥ ৪ ॥

সকাল ন'টা থেকে দশটা।

অফিস টাইমে ট্রামেতে বাদুরঝোলা ভীড়। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি ঠেসাঠেসি মারামারি আর বকাবকি। চতুর্দিকে তিক্ততা, বিরক্ততা, অসহিষ্ণুতা, অধৈর্যতা ও চরম অভদ্রতা।

ডালহাউসীগামী ট্রাম। কলেজ স্ট্রীট থেকে বৌবাজারের মোড়ে গাড়ি ডান দিকে বেঁকতেই এক ভদ্রলোক পড়ি কি মরি অবস্থায় চলন্ত ট্রামটি ধরে ফেলে বলেন, এটা ডালহাউসীর গাড়ি তো? যেন সমস্ত আরোহীবৃন্দকেই লক্ষ্য করে তিনি প্রশ্নবাণটি ছাড়লেন।

শুধু হ্যাঁ বললেই বা সামান্য মাথা নাড়লেই যেখানে ল্যাঠা চুকে যেত সেখানে শুকনো খড়ের গাদায় যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়ল।

প্রথমজন বললেন, আর কোথায় যেতে পারে? গাড়ি ডানদিকে বেঁকল কেন?

দ্বিতীয়জনের প্রশ্ন হল, কোথায় গেলে আপনার সুবিধে হয়? বলুন সেই দিকেই ফেরাচ্ছি। বিবাদীবাগকে কি বাদীবাগ করলে চলবে?

তৃতীয়জন ব্যঙ্গোক্তি করলেন, মশায়ের কখন চৈতন্য হল? ট্রামে চড়ে বোধ হয়? না কণ্ডাকটারকে দেখে?

চতুর্থজন রং চড়ালেন, শ্যামবাজার গ্যালিফ স্ট্রীট না বেলগাছিয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে? যাবে ঠিকই, তবে ফিরতি পথে। আসার ভাড়া লাগবে—সিংগিল ফেয়ার ডবল জারনি, চলে না দাদা।

পঞ্চমজন ভ্রুকুটি করলেন, ট্রামের নম্বর দেখেননি? ইংরাজীতে বড় করে 'টু' লেখা সামনে।

ষষ্ঠজন প্রকাশ করলেন, না একটু পরে কেটে পড়বার তালে? ধর্মতলার ট্রাম বলে ভুল হয়েছে বলে? তাই না? কি?

সপ্তমজন টিপ্পনী কাটলেন, নয়া মাল বোধ হয়। কোথায় নেমেছেন দাদা? শেয়ালদায় না হাওড়ায়? মানে ইস্টে না ওয়েস্টে?

অষ্টমজন জানতে চাইলেন, প্রকৃতস্থ আছেন তো বাবু? ক'টা আঙুল নড়ছে বলুন তো? বলে একটি আঙুল ক্রমাগত নাড়তে থাকলেন।

নবমজন রসিকতা করলেন, মনোপাখী কোথায় পালিয়েছে? অত আনমনা হলে গাড়ির তলায় পড়বে যে বাবা। গণতন্ত্র একটা ভোটার হারাবে।

দশমজন বলেন, এ বোকামিতে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। হরেক কিসিমের ঝামেলা সামলাতে জ্ঞানগম্যি হারাবার দাখিল। তায় আবার রোজই নিত্য নূতন ট্যাক্স। বাপ্‌স্! প্রাণ যায় আর কি! বেঁচে থাকাই তো আজকে বিড়ম্বনা!

ভদ্রলোক ততক্ষণে ঠেলেঠুলে ভেতরে ঢুকে হাবলা হাবলা মুখে ভুলভুল করে নির্বাক হয়ে চেয়ে আছেন যেন কি বিরাট একটা অপরাধ তিনি করে ফেলেছেন।

কলকোলাহল ততক্ষণে জুড়িয়ে এসেছে। মধ্যে মধ্যে মন্থর গতি হলেও যাত্রীর ওঠানামা আর বড় একটা হল না।

বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে পৌছবার আগেই ট্রাম না থামলেও ভদ্রলোকটি তড়িৎগতিতে নেমে পড়ে যেন জনসমুদ্রে হারিয়ে গেলেন।

লালবাজারের কাছে ট্রামে গুঞ্জন শোনা গেল। ক্রমবর্ধমান গুঞ্জনধ্বনি চিল্লাচিল্লি আর বাগ-বিতণ্ডা। স্বর সপ্তমে উঠল।

প্রথমজনের জামার ভেতরের পকেট কাটা গিয়েছে; ক্লিন কাটা—প্রায় আড়াইশো টাকা সমেত ব্যাগটি হারিয়েছে। কোথায়, বা কখন?

দ্বিতীয়জনের সোনার ঘড়িটি সিল্কের ব্যাণ্ড সমেত কেটে নিয়ে গিয়েছে। কে বা কারা?

তৃতীয়জনের পকেট থেকে দামী কলমটি লোপাট হয়েছে জানা গেল। কিরূপে বা কেন?

চতুর্থজনের ফোলিও ব্যাগটি নেই। পাশে রেখে তিনি ভাতঘুমে ঝিমোচ্ছিলেন। তন্দ্রা টুটতেই যা দেখলেন তা স্বপ্ন না মায়া না মতিভ্রম?

পঞ্চমজনের চারটি সোনার বোতাম চেনসহ কে বা কখন খুলল বোঝা যায়নি—ভেল্কীই বটে।

জনগণের জেরা শুরু হয়েছে—যেন প্রশ্নবন্যা।

অত টাকা ক্যারি করছেন, একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলেননিই বা কেন?

এক পলকে গেল তো অতগুলো টাকা?

ব্ল্যাকের ধন নয় তো দাদা?

পাপের টাকা নাকি বাপ?

আর বাহার দিয়ে কোটের বোতাম খুলে রেখেছিলেনই বা কেন ?

স্টাইলে না টাকার গরমে ?

কি ঘড়ি স্যারের ?

সোনার না রোল্ডগোল্ডের ?

ওমেগা টিসট রোলেক্স ?

চেন ব্যাণ্ড পরেননি কেন ? সকলেই তো পরে আজকাল।

কলমটা পার্কার না শেফার্স গো বাবুর ?

কতদিনের হল ? কেনা না টানা ?

বাসে ট্রামে ছ'আনার কলম ব্যবহার করতে হয় জানেন না ?

ফোলিও ব্যাগটি কোলে রাখতে কি হয়েছিল ? হাতে ধরে ?

দাদুর ঘুমকেও বলিহারী ! ঝিমোনোর আর জায়গা পেলেন না ?

দিদিমা আছেন, না স্বর্গে ?

সোনার বোতাম ? বলেন কি ?

বাইশ না চোদ্দ ?

ভায়ার বিয়ের নাকি ? তবে তো মোক্ষম মার, দুনিয়ার বার। আট আটটা ঘর খুলে ফেললে আর বিন্দু বিসর্গ জানলেন না !

আর একটা বিয়ে করবেন নাকি ? বোতাম পাবেন ?

বাদানুবাদ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল কিন্তু সবই এখন মিথ্যা। ডালহাউসীতে ট্রাম এসে থেমেছে।

সত্য হচ্ছে দশজনে যাকে হাবাগবা বলে রায় দিয়েছিল সে সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল যে সে বোকা নয়।

॥ ৫ ॥

হিয়ারসে এভিডেন্স।

আগেই বলে রাখছি ঘটনাটি আমার স্ত্রীর নিজের কানে শোনা এবং আমার আবার স্ত্রীর কাছে শোনা আমার নিজের কানে; মানুন আর নাই মানুন আপনার ইচ্ছে, কিন্তু শুনে রাখতে দোষ কি?

অতি উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বরবধূর "আজি ফুলশয্যার দিনে" শোনা গেল—আচ্ছা জলি, বাই দি বাই, অলকের কাছে তোমারই কথা মধ্যে মধ্যে শুনেছি না? অলক গুহ রায় ব্যারিস্টার, কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে থাকে, লম্বা মতন ফর্সা গোছের। তুমি খুব সিনেমা যেতে, হোটেলে খেতে, হাসি-হল্লা করতে খুব ভালবাসতে, তাই না? ছুটিছাটায় কাছাকাছি ঘুরেফিরেও আসতে? ও বলত মেয়েটা নামেও জলি কাজেও জলি। গুড সার্টিফিকেট।

ও হো, অলকদা? হোয়াট্ এ ফাইন্ ফেলো! অলকদা দি গ্রেট্! যেন রিচার্ড দি লায়ন হার্টেড। সে তো আমার মেসোমশায়ের কাছে এখনও আসে ডেভিলিং করতে। ভেরী ফ্রিকোয়েণ্টলি—উই ওয়ের সো থিক্ অ্যাণ্ড থিন্—থাক্, কি করে বোঝাই তোমায়?

না, বোঝাবার দরকার নেই—আমি জানি।

কিন্তু, অলকাদের সঙ্গে তোমাদের কি রকম জানাশোনা? ফার্ণ রোডের অলকা? আমরা পাশাপাশি বসে ছ বছর পড়েছি—তোমার কথা সর্বপ্রথম ওরই মুখে শুনি—তোমার কথা আর ডাক্তার হাসানের কথা—এখন পাকিস্তানে সিভিল সার্জেন না কি যেন হয়েছে। ওর মুখের বুলিই ছিল—হয় হাসান নয় তো সুশান। সুশান্তটাকে ভেঙে সুশান করে নিয়েছিল।

অলকা বলো না, বল ইউরেকা—বল ইউরেকা দি ব্রাইট—বাপ-মা-মরা মেয়ে, পিসির কাছে মানুষ—এতটুকু বয়স থেকে আমি ওকে জানি। পিসি বিরাট বড়লোক, কোলিয়ারীর মালিক, ছেলেপুলে নেই, সবই তো ওই পাবে। পিসেমশায় মিস্টার কুঞ্জলাল কাঞ্জিলাল তো বহুদিনের ক্রনিক পেসেণ্ট—আমারই ট্রিটমেণ্টে আছেন। তাঁকে দেখতে তো আমায় যেতে হয় হপ্তায় অ্যাট্ লিস্ট দুবার কি তিনবার।

অলকদার কথা বলতে একটা ভারী হাসির কথা মনে পড়ে গেল, শুনবে? অলকদা যে কত ওপেন অ্যাণ্ড সিম্পল্ ভাবতে পারবে না। একেবারে চাইল্ড ইন্ দি ক্র্যাড্ল্। একদিন নিজের ট্রাউজারের পকেটে রুমালটা রেখে দিয়ে পাগলের মতন এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওদিকে কোর্টের দেরী হয়ে যাচ্ছে—মেসোমশায়ের গাড়ি দাঁড়িয়ে। আমি গিয়ে পকেটে হাত ভরে দিয়েই রুমালের কোণটা ধরে টেনে বের করে দিতেই কি বললে জান? বললে আমি উইদাউট তুমি দেখছি জলু এ পাইপ উইদাউট টোব্যাকো হয়ে দাঁড়াচ্ছে দিন দিন—অলকদা আমায় জলু বলত। তারপর কি হাসির তুফান—বাড়ি ফেটে যায় আর কি—একটা বাচ্চা ছেলের মতন সরলতায় মাখানো মনটা ছিল অলকদার। আমার এ বিয়েতে সে গোড়া থেকেই বিরোধী। আসেনি তো। একটা লেবার কেস নিয়ে আগের দিন দুর্গাপুরে পালিয়ে গেল। ওটা একটা স্রেফ ছুতো—বুঝলে না? তার প্রিয় গানই ছিল—তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলা ঘর হাসি আর গানে ভরে দিও।

হুঁ বুঝেছি, তুমি দেখছি ওয়াইল্ড র‍্যাবিটকেও হার মানালে! অলকের ওটার নাম ভালগারিটি, সরলতা বলে না। এদিকে দেখ অলকা দি ইউরেকা কত পলিশড্ অ্যাণ্ড কালচারড্। একদিন বললুম, চল অলকা, মার্কেট থেকে প্যাটিস চকোলেট নিয়ে আসি—একটু আইসক্রীম খেয়ে ঘুরেও আসা হবে আর তোমার ঐ প্রিয় খাদ্যটিও তো ফুরিয়ে এসেছে—আনাও হবে। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, ও কি বললে জান? ছাখ, চকোলেট প্যাটিস আইসক্রীম আমি খুবই ভালবাসি—নো ডাউট্—কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভালবাসি দি পারচেসার ছান্ দি থিং পারচেস্ড্। কতখানি পালিশের উপর হিউমার করলে, ধরতে পারলে? মানে আর কিছুই নয়, আমাকে একলা পেয়ে কিছুটা নিভৃতে কাটাবার ইচ্ছা আর কি। বললে কি সুন্দর! ও রকম ভালগারভাবে নয় যে একটা ভদ্র-লোকের মেয়েকে বলা, ওগো আমি তোমার হ্যানো, তুমি আমার ত্যানো—আমি তোমার পাইপ, তুমি আমার টোব্যাকো। ওটা কি জান? ওটা হচ্ছে স্রেফ তার জান্তব রিরংসার একটা লেলিহান লালসা—যত সব ননসেন্স।

জান্তব? রিরংসার?? লেলিহান??? লালসা????

বাঃ, খাসা বললে তো! উইথ্ স্টাড্ বুল টেনাসিটি গড় গড় করে বলে গেলে তো? অলকার পালিশ সম্বন্ধে তো দেখছি খুবই ওয়াকিবহাল—ওটা কালচার না হাতি। শুধু একটা বিবস্ত্রা বুভুক্ষার কপট কামোফ্লেজ। ডোণ্ট্ বি সিলি এনি ফারদার।

বিবস্ত্রা ? বুভুক্ষার ? ? কপট ? ? ? কামোফ্লেজ ? ? ? ? স্টুপিড জেলাসী ॥

গৃহের আবহাওয়া নির্বাক নিস্তব্ধ ও নিথর হয়ে গেল। জীবনের প্রথম মধু-যামিনীতেই উভয়ে উভয়ের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ঘুমিয়ে পড়েছে না হয় তো ঘুমোবার ভান করে নিজ নিজ প্রাক্-বিবাহ সুখস্মৃতি রোমন্থন করছে।

"দেখা হবে ছাঁদনা-তলায় বলে গেছে ইশারাতে" সুরে সাজ্জাদ হোসেনের সানাই খানিকটা আগে অবধি বাজছিল—কিছুক্ষণ হল থেমেছে। সুরের রেশ কিন্তু তখনও বাতাসে বর্তমান।

॥ ৬ ॥

কলেজ বন্ধ হয়ে গেল।

হোস্টেলে থাকা আর হল না বলে পুজোর ছুটিতে ইনাকে শ্রীরামপুরে চলে আসতেই হল। তবে সেদিনের প্রোগ্রাম চুকিয়ে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাওয়াতে সে টানা ট্যাক্সিতেই কলকাতা থেকে শ্রীরামপুরে গেল—অবশ্য পথে উদারা মুদারা আর তারাকে নামাতে নামাতে।

একঘর মক্কেল সত্ত্বেও কপিলবাবুর ঘরে তখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা ছিল। ট্যাক্সি থেকে নেমেই ইনা শুনতে পেল ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি দশটা বেজে গেল।

নবদ্বীপ ও হাতুবিবি ঘরের বাইরে রকেতে আধো অন্ধকারে মুখোমুখি নিবিড়-ভাবে দাঁড়িয়েছিল, ধূমপানের তাগিদে। বহুকালের পুরনো মক্কেল তারা। হাতুবিবির মুখে দিদিমণির আসার খবর পেয়ে স্বল্পভাষী পিতা নথীপত্র থেকে মুখ না তুলেই বলেন, কে, ইনু নাকি রে? সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে কলিং বেল টিপে দিলেন বৈজু চাকরের উদ্দেশ্যে। পরক্ষণেই মামলার কাগজে আবার ডুবে গেলেন। মিটারের আলো জ্বললে ড্রাইভারের গলা পাওয়া গেল—তেঁইতিশ রুপেয়া। পরে দ্বিতীয় গলায় শোনা গেল—নেহী জি, তেঁইতিশ রুপেয়া আস্‌সি পায়সা। মিটারের টিং টিং আওয়াজে বোঝা গেল ভাড়া পেয়ে ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে—ক্রমশ শব্দ জুড়িয়ে গেল।

গলিপথে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মা সরোজিনী বলেন, এত রাত্তিরে এতটা পথ একলা ট্যাক্সিতে আসাটা তোমার ঠিক হয়নি—যখন দেখলে ট্যাক্সিওলা দুজনে—আর তুমি একা তাও মেয়েছেলে তাও ছেলেমানুষ—কাজটা তোমার খুবই অন্যায় হয়েছে। সবই তো বুঝতে পার। এতটা সাহস দেখানো তোমার আদপেই ভাল হয়নি, কি দিনকাল পড়েছে এখন, কাগজ পড় না?

ইনা থতমত খেয়ে গেল। কৃতিত্বের পরিবর্তে ভৎর্সনার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নীচের দালানে সিঁড়ির মুখেই ঠাকুরমা বৃদ্ধা হেমনলিনী নাতনীর চিবুক ধরে আদর করলে কি হবে, বকতে ছাড়লেন না—খুব তো ধিঙ্গি হয়েছিস লো ইনু—কোথায় তোর কলেজ আর কোথায় তোর শ্রীরামপুর—এদেশ আর ওদেশ—এতটা রাত্তিরে একলা এক ফোঁটা মেয়ে ট্যাক্সিতে এলি—

ড্রাইভাররা দুজনে, যখন দেখলি, তুই আজ এলি কেন? কাল দিনের বেলায় রেলে এলি না কেন? কত ক্ষেমতা রাখিস তুই? কি যুগ্যতাই বা আছে—তোকে যদি গলা টিপে কেটেকুটে তোর সর্বস্ব নিয়ে ওরা ভাগত কিংবা তোকেই যদি সীতা হরণ করত—কোন্ রাম রাজা তোকে উদ্ধার করতে আসত, বল্? মেয়েমদ্দানী এতটা না দেখালেই ভাল হত—ছি ছি, একটুও ভয়ডর বলে কোন পদার্থই কি শরীরে নেই? তোর মা এখনো যে একলা গঙ্গাচ্চানে যেতে পারে না—তাও তো গঙ্গা বাড়ির পেছনেই—আর তুই? কি গেছো মেয়েরে বাবা! নমস্কার তোদের শহুরে মেয়েদের ক্ষুরে ক্ষুরে—।

এবারে ইনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, বলে, তোমরা কোন্ যুগে পড়ে আছ জানি না—মেয়েরা এখন ইঞ্জিন চালায়, জজিয়তি করে, চাঁদে যায়—কাগজে দেখ না? আজকের মেয়ে বলেই এটা সম্ভব—তুমি বা মা কোনদিন পারতে? বোঝ না তো কিছু, তবে শোন আমার মতন একটা মেয়েকে দেখে—চেয়েই ছাখ না কেন একবার আমার দিকে ভাল করে—কি বহ্নিশিখা; কত পাবক এতে পুড়তে পারে তা জান? তাই বলছি আমার মতন একটা মেয়েকে দেখে এত রাত্তিরে একলা এতটা পথ আসতে হবে শুনে কোন ট্যাক্সিওলাই রাজী হচ্ছিল না, তা কি খবর রাখ? এই বীর পুরুষটিও তাই সমূহ বিপদ থেকে নিজের আত্মরক্ষার জন্য ঐ সাথীটিকে শ্যামবাজার গ্যারেজ থেকে দুটো টাকা দেবো বলে বডিগার্ড হিসেবে নিয়ে এসেছিল তার নিজেরই প্রোটকশনে। যাক্ গে ঠাকুমা, এসব বড় গোলমেলে ব্যাপার; তুমি বুঝবার চেষ্টাও কোরো না—বুক ধড়ফড় করবে, না হয় তো মাথা ঝিমঝিম শুরু হবে—বাপিকে আবার ভোগাবে—বরঞ্চ আফিমটুকু খেয়ে শুয়ে পড়গে—রাতও তো অনেক হয়েছে—আমিও তোমার কাছে শোব—আর রাত্রিতে পাখা চালাব কিন্তু ফুল স্পীডেই। ফাংশানের পরে ওরা সব জোর করে কি খাইয়ে দিলে—তখন থেকেই মাথাটা যেন কেমন কেমন।

ইনার রায় শুনে তার ঠাকুরমা নিজ পুত্রবধূর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে কেবল চেয়েই রইলেন—বাক্যস্ফূর্তি হল না। বেশী না ঘাঁটানোই ভাল—আবার কি বলতে কি বলবে? কত কি আবার শোনাবে, দরকার কি?

ইনার ঠাকুমার রাত্রে একটু আফিম খাওয়া অভ্যেস ছিল—নগেন কবিরাজের প্রেসক্রিপসানে—তাও বলে রাখি।

॥ ৭ ॥

একটা দাঁত নড়ছিল কিন্তু পড়ছিল না।

ক'দিন ধরে বেশ কষ্ট পাচ্ছিলাম।

বড় ডেন্টিস্ট, পার্ক স্ট্রীটে চেম্বার, দেড় লাইনে ডিগ্রী, যুবতী রিসেপ্সানিস্ট ও মহিলা কম্পাউণ্ডার।

পাড়ার কাউন্সিলারের পরিচিত, তাঁর চিঠি নিয়ে দেখা করলাম। ফর্দ দিলেন প্রায় তিরিশ টাকার, আট টাকা কনসালটেশন ফী, ষোল টাকা মজুরী ও ছ' টাকার ওষুধবিষুধ।

বললাম, দাঁতটা তো খুবই নড়ছে।

ডাক্তার হাসলেন, বললেন, ইয়েস্ স্যার, নড়া দাঁত তোলাই শক্ত—শক্ত দাঁত তোলা সহজ—বাট্ ইট্ উইল বি পেন্‌লেশ। আপনাকে তো হাফ চার্জ বলেছি—বলে চিঠিটির দিকে দেখালেন।

বলি একটা দাঁত তুলতে তিরিশ টাকা, এইটাই তো খুব পেনফুল।

ডাক্তার আবার হাসলেন, আবার বললেন, বলেন কি স্যার? ধরুন ইনজেকসন্ আপনি স্ট্যাণ্ড করতে পারলেন না, চেয়ারেই ঢলে পড়লেন, তখন? তখন আপনাকে সামলাব, না দাঁতকে সামলাব? তখন তো গ্যাস, এনেসথেসিয়া; দিস্ ছ্যাট্ একসেটরা। তারপর ধরুন দাঁতের রুটটা আমি হয়ত ধরতেই পারলুম না। তখন তো এক্সরে; অন্তত চারটে প্লেট কমসে কম। ধরুন এক্সরেতে দেখলুম রুটটা বেঁকে আছে, তখন? তখন তো অপারেশন করা, স্টিচ করা—মানে আর কি একটা নার্সিং হোম বুক করা যাদের একটা ভাল অপারেশন থিয়েটার আছে এমন গোছের—তবে অত ঘাবড়াবার কিছু নেই—পাকা হাতে এসে পড়েছেন যখন। টাকার কথা তুললেন তাই বলতে হল দি এণ্টায়ার হিস্ট্রিটা।

আমি বলি, আচ্ছা একটু ভেবে দেখি। আটটা টাকা রেখে নমস্কার করে পালালাম।

পরের দিন তিরিশ পয়সায় একশো গ্রাম ভাজার বড়ি কিনেছিলাম। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিহীন ভাবেই কিনেছিলাম, কোন পরিকল্পিত অভিপ্রায় ছিল না। খেয়েও ছিলাম সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে, কোন মতলব ভেঁজে নয়—। কখন খুট

করে একটু শব্দ হল, টের পেলাম বটে, কোন ব্যথা বোধ করলাম না। অনুভব করলাম দাঁতটি আপনিই পড়ে গেল।

পরের দিন কাউন্সিলার বললেন, দেখলেন তো মশায়, বড়র নামের বৈশিষ্ট্যই আলাদা। অর্ধেক ক্ষেত্রে কেবল নামেই মুস্কিল-আসান হয়। আমি দাঁড়াচ্ছি শুনলে অর্ধেক মামলা মিটে যায়—তা জানেন—আদার সাইড্ টার্মস অফার করে। সঙ্গে সঙ্গে সোলেনামা ফাইল।

বলা বাহুল্য, কাউন্সিলার ভদ্রলোকটি উকীল মানুষ।

বড়র বৈশিষ্ট্য বুঝিনি, কিন্তু বড়ির বৈশিষ্ট্য বুঝেছি।

॥ ৮ ॥

সন্ধ্যা সমাগতা—

ভোম্বল তখনও বাড়িতে আসেনি। কলকাতায় সেই সময়ে ভীষণ ছেলে ধরার উৎপাত—চতুর্দিকে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে। ঠাকুরমা বলেন, বড় বৌমা, ভোম্বল এখনও বাড়ি এল না—সাঁঝের বাতি জ্বলে গেল যে, দিনকাল যা খারাপ।

কি জানি মা, অন্য দিনে তো ছেলে এর ঢের আগেই এসে যায়—আজ তো আবার স্কুল থেকে ফিরেছেও সকাল সকাল—কেন যে দেরী করে বুঝি না, সুষমার জবাব এল।

পিসিমা নন্দা ঠাকুরঝি ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাদীপ দিতে দিতে বলেন, বইগুলো তো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই চম্পট দিলে—শুনিওনি ভাল করে—খেলা আছে না কি যেন বলে গেল—খাবারটা খেতে খেতেই তো ছুটলো দেখে আমি আবার বলে দিলাম ঠিকমত সময়ে বাড়ি আসিস, দেরী করিসনি যেন।

ঠাকুরমা মালা জপতে জপতে বলেন, আর কিছুর জন্যে তো নয়—এখন যা ছেলেধরার হুজুগ শহরে, ছেলেপুলে যতক্ষণ না বাড়ি ফিরছে, শান্তি নেই।

জেঠাইমা বলেন, তাছাড়া বাড়িতে এমন একটা লোক নেই যে একটু খোঁজখবর করে—ওই তো নড়েভোলা হাবা কালা বদ্যিনাথ। কদিক সামলাবে?

বদ্যিনাথ বাড়ির চাকরের নাম। অনেক আগেই তাকে পাঠানো হয়েছে।

একবার ও-বাড়ির শতদলকে না হয় ডেকে পাঠাই—আর ছেলের বাপই বা কেমন লোক? সকাল সকাল যদিই বা ফিরলেন তো গিন্নীকে নিয়ে সিনেমায় গেলেন—বলে গেলেন মেদিনীতে পাস পেয়েছি, একবার ঘুরে আসি—পাস না ছাই—পিসিমার উত্তর হল।

শীতের বেলা—চারটেতেই যেন সাঁঝের আঁধার নেমে আসে।

ঘড়িতে ছ'টা বাজতেই বাড়ির উত্তেজনা চরমে পৌছল—বংশপ্রদীপের ঐ একটিই সলতে পলতে।

ইতিমধ্যে বদ্যিনাথ ঘুরে এলে পরে সকলের যুগপৎ প্রশ্নে সে জর্জরিত হয়। ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করলেন, মাঠ ভাল করে দেখেছিস তো? তুই আবার যা হাঁদা।

মাঠ একেবারে ফাঁকা—কেউ কোথাও নেই শুনে পিসিমা বলে, হাবলা কি বললে রে, সেখানে আড্ডা দিতে যায়নি তো ?

হাবলাবাবুর জ্বর হয়েছে, কিচ্ছু জানে না, শুনে জেঠাইমার প্রশ্ন—বিজলী ক্লাবে দেখেছিস একবার—রিহার্সেল শুনছে না তো বসে বসে ?

এবারেও বদ্যিনাথ মাথা নেড়ে বলে, ক্লাব ঘরে কেউ নেই—চাবি দেওয়া—ভেতরেও অন্ধকার।

অগত্যা বদ্যিনাথকে দিয়েই শতদল দাদাবাবুকে ডেকে পাঠানো হল—ও-বাড়ির ছেলে শতদল পাড়ার সকলের আপদে-বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে—এখনও বেকার, ডাকলেই পাওয়া যায়। বিরক্ত হয় না।

সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে শতদলকে থানায় যেতে হল—হাসপাতালে খোঁজ করা পরে হবে'খন। ছেলে চুরির ব্যাপার হাসপাতাল কি করবে ?

বিরাটকায় ও-সি সব শুনে বলেন, শতদল কি ? কুমার না বাসিনী ? মাগী, না পাগল-ছাগল ?

জবাব পান, না, শুধুই শতদল—শতদল মজুমদার, আমারই নাম—আমি হারাইনি—যাকে পাওয়া যাচ্ছে না সে ছেলেটি হল ভোম্বল—ভাল নাম স্নেহেশ-কুমার—ওরা দাশগুপ্ত, বয়স বারো, রং ময়লা, রোগা গোছের, বাঁ চোখের কোলে কাটার দাগ আছে, একটু তোৎলা, মাথায় এতটা হবে—বলে শতদল মেঝে থেকে উচ্চতা হাত দিয়ে দেখাল।

ও-সি ভ্রু কুঞ্চিত করে বলেন, হুঁ, ছেলের বাপ কোথায় ? আপনি তো পাড়াতুতো দাদা, তাই না ? বাড়িতে ডাগর মেয়ে আছে বুঝি ? বুঝে গেছি—এখন ভালয় ভালয় ছেলের বাপকে ডেকে আনুন—ডায়েরি লেখাতে—বাজে বিরক্ত করবেন না। মানে মানে কেটে পড়ুন।

ওর বাবা মা সিনেমাতে গেছে—মেদিনীতে—বলেন তো ফিরলেই নিয়ে আসছি।

ইতিহাসের বাকিটা শুনে ও-সি দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকায়, পরে মেদিনীর ম্যানেজারকে টেলিফোনে ডেকে ইণ্টারভ্যালে অ্যানাউন্স করে দিতে বলেন, বেনেটোলার বিনয়বাবু, বিনয় দাশগুপ্ত এখুনি যেন বাড়ি চলে আসেন—বিশেষ দরকার, থানা থেকে বলছি।

রিসিভার নামিয়ে ও-সি দুটি সিগারেট বার করে চরম নির্লিপ্ততা মাখানো মুখে একটি টেনে দ্বিতীয়টি হাতে ধরে রইলেন—চোখ বোজাই ছিল

যেন সারা ছুনিয়া রসাতলে গেলেও তাঁর কিছু আসে যায় না—তাঁর জীবনের জমা বা খরচের দিকে কিছুই যোগ বা বিয়োগ হবে না।

আগের দিনের শ্মশানের মুড়িপোড়া বামুনটার ছবি শতদলের সামনে ভেসে উঠল। অরিন্দমবাবুর কচি বউটাকে চিতায় তোলা হলে দ্বিজবর মুখের বিড়িটা হাতে ধরে বলেছিল—নিন, এবারে এনার স্বামী কোন্ বাবুটি—এগিয়ে আসুন, মুখে আগুন দিতে হবে—খামকা দেরী করেন কেন? আজকে মড়ার বেশ ভীড়। মন খারাপ করবার কিছু নেই বাবু, এ হল শুধু থিয়েটারের সিন বদলানো—ছুদিনেই সব ঠিক, চিতার আগুন থেকেই বিয়ের আগুন না জ্বালতে হয় দেখুন।

সিগারেট ছুটি পর পর ধ্বংস করে ও-সি বাবু এবারে চোখ খুলে শতদলের দিকে বললেন, এখানে বসে আর কি রাজত্ব লাভ হবে—এখন বাড়ি চলে যান—যদি দরকার হয় বাপকে নিয়ে আবার আসবেন—আমি এখনও খানিকটা আছি। পরে হাঁকলেন, এ রাম অওতার, লক-আপমে ডবল তালা লাগাও।

শতদল বাড়ি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বিনয়বাবুর স্ত্রী-পুত্র সহকারে গৃহপ্রবেশ হল। প্রকাশ পেল যে বাপ-মাকে সিনেমা যেতে দেখে ছেলে কিছুতেই ছাড়ল না বলে বাধ্য হয়ে তাকে সঙ্গে নিতে হল—খবর দেওয়ার সুবিধা হয়নি। সময় ছিল না।

ঠাকুরমা অনেকক্ষণ ধরে ঠাকুরঘরে প্রণাম করে উঠে বলেন, আমার নারায়ণই ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন রে—বড় বৌমা, বদ্যিনাথকে সওয়া পাঁচ আনার বাতাসা আনতে দাও তো মা।

নয়া পয়সার আমলেও তিনি আনা পাইয়েতে আছেন। পিসিমা টুকলেন—নারায়ণ ছেলেকে তো পাঠালেন, কিন্তু কোথায়? বাড়িতে?

জেঠাইমা বলেন, না, সিনেমায়।

শতদল বলে, হ্যাঁ, ছুজনেরই কথায় ভুল হয়নি বটে তবে ঠাকুরমার কথাই অল্ কারেক্ট।

ও-সি-টিও নারায়ণ—নাম শ্রীনারায়ণপ্রসাদ ঘোষ রায়।

॥ ৯ ॥

হরিশবাবু আমার টাইপবাবু।

এক শনিবারে অফিসের কাজকর্ম চুকিয়ে তিনি বাড়ি গেলেন; দেখা করে বলে গেলেন, শরীরটা ভাল নেই স্যার, জ্বর জ্বর ভাব।

পরের শনিবারে একটি পোস্ট কার্ডে জানলাম হরিশবাবু মারা গেছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল—আজ প্রায় পনেরো বছরের বেশী তিনি আমার কাছে ছিলেন—কত বকাবকি করেছি। সত্যই তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন, যেমন বিশ্বাসী তেমনি অনুগত। তবু শান্তি পেলাম যে যাওয়ার দিনে তাঁর হাতে মাসকাবারি মাইনেটা ভাগ্যিস দিয়েছিলাম—হয়ত একবারও ডাক্তার দেখেছিল বা এক দাগ ওষুধও পড়েছিল।

কথাটা দিনের মধ্যেই জানাজানি হয়ে গেল। আশেপাশের অফিসের টাইপিস্টরা খবর পেয়ে থাকবেন।

কয়েকজন ইতিমধ্যেই নূতন কাজের সন্ধানে আসতে শুরু করেছেন—দুজন ছাড়া কাকেও বিশেষ পছন্দ হল না। একজন শ্রীপরিমল দে সরকার, অপরজনের নাম বলল শ্রীকল্পনা ভট্টাচার্য, কিন্তু তিনি মহিলা।

প্রথমজন সাধারণ টাইপিস্ট তবে স্পীড আছে মন্দ নয়। দ্বিতীয়ার ছাপার গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর বটে, সর্টহ্যাণ্ডও জানা আছে চলনসই গোছের।

চূড়ান্ত মনোনয়ন করতে পারছিলাম না বলে দুজনকে দু দিনে পৃথক ভাবে এসে আলাপ করতে বলি।

কল্পনাকে বেশ কিছুটা ডিক্‌টেশন দিলাম—লিখল ভালই—অল্পস্বল্প ভুলভাল যা করল তা চালিয়ে নেওয়া যাবে।

একথা সেকথার মধ্যে সে বলতে ভুলল না যে তাকে নিয়োগ করলে আমার একটা সুবিধা হবে এই যে হুজুগের ঝাপটটা ও দাবীর দাপট্‌টা পড়বার আশংকা নেই। সে সম্প্রতি বিয়ে করেছে, স্বামীও গভর্ণমেণ্ট অফিসে কাজ করেন, ভাল মাইনের, ছেলেপুলে নেই—অভাব অনটন এমন কিছুই নয়—ভদ্রভাবেই কাজ করতে চায়—পারিশ্রমিক কমেতে আপত্তি হবে না। চাকরির স্থায়িত্ব এবং মনিবের ভদ্রতাই মুখ্য বিবেচ্য। তাকে বলি—সবই তো শুনলাম,

একটু ভেবে দেখি।

অপরদিন পরিমল কথা বলতে এল। একথা সেকথার পর বলতে ভুলল না যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের কর্মদক্ষতা পটুতা ও শক্তি বেশী তো হবেই—প্রকৃতির নিয়ম; যে কোন জজেও মানবে। অত কথায় কাজ কি—স্কুলের বইয়েতে কি দেখেননি যে অঙ্কে বলা থাকে—যদি কোন কাজ পাঁচজন পুরুষ অথবা দশজন স্ত্রীলোক অথবা পনেরোজন বালক সাত দিনে করতে পারে তবে কতদিনে এতজন পুরুষ ও এতজন স্ত্রীলোক ও এতজন বালক সেই কাজটি করবে—কই সেখানে তো কখনও এমন কথা বলা থাকে না যে যদি কোন কাজ পাঁচজন বালক অথবা দশজন স্ত্রীলোক অথবা পনেরোজন পুরুষ যদি সাত দিনে করতে পারে ইত্যাদি, থাকে কি?

অকাট্য যুক্তি—খণ্ডানো শক্ত।

বললাম, কল্পনা কিন্তু আবার কিছুটা স্টেনোগ্রাফারও বটে—ওটাও তো একই মাইনেয় উপরন্তু লাভ, তাই নয়?

পরিমল যুক্তি দেখাল, লাভ তো নয়ই, অধিকন্তু লোকসান—টাকার দিক দিয়ে লস্। পরিমলের পূর্বের অফিসের মিস্টার রয় পুরো এক ঘণ্টার উপর নিতেন একটা দু লাইনের চিঠি ডিক্টেশ্ন দিতে, সেখানেও ঐ লেডি স্টেনোর ব্যাপার। নারী, নরকের দ্বার, তা জানেন স্যার?

পরিমলকেও বলি, হুঁ, তা বটে—আচ্ছা একটু ভেবে দেখি—

পরের শনিবারে অফিসে গিয়ে দেখি আমার পুরাতন টাইপবাবু এসে গিয়েছেন। শরীরে কৃশতা তখনও পরিস্ফুট রয়েছে।

পোস্টকার্ডটা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা-পত্রের পরে জানলাম যে আমার ও টাইপবাবুর বরাত খুবই ভাল যে কাকেও তখন পর্যন্তও নিয়োগপত্র দিইনি—দিলে নাকি বহুরকমের ঝামেলায় পড়তাম ও বেশ কিছু অর্থব্যয় হত।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে পরিমল বা কল্পনা কেউই তার পরে আর কোন দিন আসেনি।

॥ ১০ ॥

বড় বাড়ির ছোট বৌ

আর ছোট বাড়ির বড় বৌ। ভাইয়ে ভাইয়ে মুখ দেখাদেখি না থাকলে কি হয়, জায়ে জায়ে একদিনও দেখাদেখি না হলে দুজনেই হাঁপিয়ে ওঠে।

একজন অপরজনকে লুকিয়ে-চুরিয়ে মাছ ভাজা আর ভাপা দৈ খাওয়ায়—অপরজন আড়ালে-আবডালে হাতি-পেড়ে ঢাকাই শাড়ি দিয়ে বলে, এটা পরিস বড় বৌ—আমার আবার এতটা চওড়া পাড় তেমন পছন্দ হয় না, তাঁতী গছিয়ে দিয়ে গেল, কিছু বলতে পারলুম না। তুই পরিস ভাই, মানাবে ভাল। পরবি, বুঝলি, আমার দিব্যি রইল।

কিন্তু সবকিছুই গোপনে গোপনে—আড়ালে-আবডালে। যবনিকার অন্তরালে।

সিংহবাড়ির সমান আধাআধি ভাগ ; আলাদা রং করেই যে কেবল তফাতটা দেখানো হয়েছে তাই নয়—পূব-পশ্চিমে দুই গেটের পাশেও পাথরের ফলকেও ছিল ভাগাভাগির পরিচয়—নয়ানি আর সাতানি, লোকে বরাবরই এদিকেরটাকে বলত বড় বাড়ি আর ওপাশেরটাকে বলে আসছে ছোট বাড়ি।

কেন বলে, বলছি।

নীলাঙ্কশশীকে পুষ্যিপুত্তুর নেওয়ার পরের বছরই রায় অনঙ্গশশী সিংহের ঘরে যখন লীলাঙ্কশশী এলেন—নীলাঙ্কশশীর আপনজনেরা সবরকমই কেচ্ছা কাহিনী রটাতে কসুর করেননি।

রায়সিংহ তিক্তবিরক্ত হয়ে পুরনো উইল ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে উইল লিখতে বসলেন—লিখলেন বসত বাড়ি ছাড়া সমস্ত সম্পত্তিই গৃহদেবতা গোপালকে দিয়ে গেলুম। দুই ছেলেই সেবাইত হবে আর দেবোত্তর সম্পত্তির খরচখরচা বাদে আয়টাতে উইলমত ভাগাভাগি করে দুই ছেলেই বংশপরম্পরায় ঠাকুর সেবা করে যাবে। দোল ঝুলন জন্মাষ্টমী রাধাষ্টমী রাসযাত্রা সবকিছুই ঘটাপটা করে হবে তো বটেই অধিকন্তু যাত্রাগান, কবির লড়াই, ম্যাজিক লণ্ঠন, তরজা, বাইনাচ, ভূরিভোজন, কাঙ্গালি বিদায় কোন অনুষ্ঠানই যেন বাদ না পড়ে, ফিকে না হয়ে যায়। খরচ-খরচা আলাদা আলাদা বরাদ্দ করে দেওয়া হল।

এ হল পাঁচ পুরুষ আগেকার কথা। অনঙ্গশশী চোখ বোজবার সঙ্গে সঙ্গে

জিনিসটা কোর্টে গড়াতে গড়াতে উইলের শেষ বিচার প্রিভিকাউন্সিল করে দিলেন—বলে দিলেন লীলাঙ্কশশী হবেন নয়ানির শরিক—আর নীলাঙ্কশশীকে বলা হল সাতানির মালিক। সেবাইতিতে কিন্তু দুজনেরই সমান অধিকার এবং তুল্যাংশে সমান হিস্যাদার—কেবল একজন পাবেন নীট আয়ের ন আনা, অপর জন সাত আনা। বসত বাড়ির ভাগাভাগিতে কমবেশী হল না; বাড়ির নকশার মাঝখান দিয়ে সরল রেখা টানা হল, পাঁচিল গেঁথে দু বখরা করতে সব জড়িয়ে মোট খরচ হল তখনকার কালেই আড়াই লক্ষ টাকা—তা হোক, তবু তো একটা হেস্তনস্ত হল যা হোক—আর কোর্ট-কাছারিই যদি না হল তো বিষয়ের বিশেষত্ব রইল কি? তা ছাড়া কর্তা তখন সবে গেছেন, কলসীতে জলও ছিল প্রচুর, কত গড়াবে গড়াও না—এখনকার মতন ভাঙা থামের সারি আর গোলা পায়রার আড়ৎ তো ছিল না!

দেড়শো বছরের গোপালকেও সমান ভাগ করে দু শরিককে দেওয়া হল। এক বছর অন্তর ঠাকুর এ-বাড়ি ও-বাড়ি পালা খেটে বেড়াবেন।

কোর্টের পাঁচিল যে দু বাড়ির মধ্যে কাটান-ছেঁড়ানের রেখা টেনে দিয়ে গেল, পাঁচ পুরুষেও কেউ সেটা মুছে ফেলতে পারেনি, অনেকটা মিলিয়ে এসেছে এ পর্যন্ত, কেননা যেখানটা ভেঙে যাচ্ছে আর গাঁথা হচ্ছে না। তবুও সেলাইয়ের দাগ দেখে মেজর অপারেশনের বহর খুবই বোঝা যায় এখনও।

বড় বাড়ি ছোট বাড়িকে এর আগে অনেকবারই বলে এসেছে, এখনও যে বলে না তা নয়, বলে ভিক্ষেপুত্তর যেমন নেওয়াও হয়েছিল, ভিক্ষেও তেমনি যথেষ্টই দেওয়া হয়েছে। আর কেন? কে কোন্‌দিন কাকে এতটা ভিক্ষে দিয়েছে এ ভূভারতে?

ছোট বাড়ি বড় বাড়িকে পাঁচ পুরুষ ধরে শুনিয়ে এসেছে, এখনও যে বলা বন্ধ করেছে তা নয়, বলে বংশের ছেলে না আরও কিছু—দাসীপুত্র, স্রেফ দাসীপুত্তর ছাড়া আবার কি? উমাশশী আর কিরণশশীকেই তো লোকে জানত। লীলাঙ্কশশীর মা হৈমবতীর নাম কে কবে আবার শুনেছে? অমন হৈমবতী তো তখনকার কালে গণ্ডা গণ্ডা গড়াগড়ি যেত—ক'টা লীলাঙ্কশশীর হিসাব কে রেখেছে? যাঁরা আবার হৈমবতীকে স্বীকৃতিও দেন তাঁরা আরও কটু কথা বলেন। বলেন লীলাঙ্কশশীর জন্মবৃত্তান্তটা বড় গোলমেলে। কর্তার শেষ বয়সে পক্ষাঘাতে নিম্নাঙ্গ পড়ে যাওয়ার কথা কে না জানে? বড় ঘরের বড় কেচ্ছা, যত না বলা যায় ততই ভাল। আমরাও বলি তাই, ঘরের কেচ্ছা যত না বলা যায় ততই ভাল। তা সে বড়ই হোক বা ছোটই হোক।

দোলের আগের চাঁচরের দিন ঠাকুর দেওয়া-নেওয়ার পালা। ছোট বৌ কোলে করে গোপালকে নিয়ে এসেছে বড় বৌয়ের কোলে তুলে দিতে। ছোট-কর্তা ঠাকুরঘর থেকে গোপালকে নিয়ে এসে নিজের গেট পর্যন্ত গিয়ে ছোট বৌয়ের কোলে ঠাকুর তুলে দিয়েছেন। গোপালকে নিয়ে রাস্তায় বেরোবেন কি করে, পাঁচটা হীরের আংটিই যে সাতানির সরিক সরিয়ে ফেলেছে—প্রতি পুরুষে চৌর্যপ্রবৃত্তি তো।

বড় কর্তা নিজের এলাকায় পথের বাঁকের মোড়ে পায়চারী করছেন। বড় বৌয়ের কোল থেকে ঠাকুর নিয়ে গিয়ে অন্দরে ঢুকবেন। ছোট বৌয়ের মুখ দেখলেই যে দিনটা মাটি হয়ে যাবে। জন্মের যাদের ঠিক নেই তাদের মুখ দেখাও যে পাপ।

গোপালকে শেষবারের মতন আদর করে ছোট বৌ কানে কানে কি বলে শোনা যায় না। বড় বৌয়ের কোলে দিতে দিতে বলে, বড় মায়ের পেটে এবারে ঢোক্ বাপু। আর ভোগাসনি।

বড় বৌ আঁচলে চোখ মুছে বলে, আর কেন ছোট, অনেক তো হ'ল। ভিক্ষেপুত্তুরের খোঁটা এক পুরুষ আরও চালাতে চাস নাকি? তার চেয়ে গোপাল তোর পেটেই ঢুকুক না কেন? পরগাছা তো নোস্ আমার মতন।

তুই থাম্ তো বড় বৌ। বেজন্মার আবার জড় রাখতে আছে? পাঁচ পুরুষেও শিক্ষা হয়নি?

বড় বৌ এক হাতে গোপালকে কোলে বাগিয়ে ধরে আর এক হাতে ছোট বৌয়ের গাল টিপে দিয়ে বলে, এতটা বেলা পর্যন্ত মুখে জল না দিয়ে আম্‌সি হয়ে আছিস তো। দুটো মিষ্টি গালে ফেলে একটু সরবৎ খেয়ে যা আগে আমার সামনে, তবে অন্য কথা। হাতের কাছেই সব কিছু রাখা ছিল।

পরে পাশের ঝি কাদম্বিনীকে ইশারা করে বলে, পান জর্দা দে রে ছোটকে।

না রে বড় বৌ, সেপাই পেছনেই।

থাক তোর কর্তা। আমারটাই কি আগলাচ্ছে না ভাবছিস, ছাখ দেখি চেয়ে ওদিকপানে।

ছোট বৌ হেসে ফেলল।

কদিন দেখিনি কেন রে ছোট? বিস্তি খেলতে এলি না?

আসবো কি ক'রে, কোবলার বাগানে লুকিয়ে দুদিন ডাঁশের কামড় খেলুম যে! রাণীবালাকে যে বাগানবাড়িতে এনে রেখেছেন বাবু। জ্বালার কি শেষ আছে রে? কত বলি বল্?

তাতে আর কিরে। তোরই কি কেবল রাণীবালা? আমার চুম্‌কীবাই নেই? বার-বাড়িতে নাকি এবার আসর-বাসর-জলসা হবে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস সাহেব, হোমরাচোমরা দোলেতে যে সব আসবে রে। গোপালের নিশ্চয়ই তাই ইচ্ছে। তাই বলি গোপাল তোর পেটেই ঢুকুক। আমার ঘর তো আমি চিনি, পাপের বাড়ি। আর কিছুই চাই না এ জীবনে। সাধও মিটেছে, আশাও পুরেছে।

আর আমি বুঝি কচি খুকী? দেখবি গোপাল কারোর পেটেই যাবে না। এই বসতবাড়ি দেখবি গোপালেরই পেটে যাবে। গোপালই মালিক হবে। ছেঁড়া উইলের কথাই ফলবে, এই বলে দিয়ে গেলুম। চলি রে বৌ।

ছোট বৌ ফিরলে ছোট কর্তা প্রশ্ন করলেন, দেরী হল কেন এত? কখন গেছ আর এই ফিরলে?

ছোট বলে, বড় বৌয়ের কথা শোন—বলে ঠাকুরঝি যে গোপালকে হীরের বালা দিয়েছিলো সেটা ঠাকুরের হাতে নেই কেন, চিরটা কালই নাকি আমরা ঠকিয়ে এসেছি। ইস্‌ তিস্‌ রাজ্যের আজেবাজে কথা, আমিই বা শুনব কেন, ছ্যার ছ্যার করে দিলুম বেশ করে শুনিয়ে।

ছোট বাবু শুনলেন বটে তবে হাসলেন না, কারণ ছোট বৌয়ের কথা বোধহয় বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন, তাই নাকি? গোপালও চাই আবার হীরের বালাও চাই? আব্দার! আজকের বাজারে তিরিশ হাজার টাকা দাম, তা জানো?

বড় বৌ ফিরলে বড়বাবুর প্রশ্ন হল, এত ফিস ফিস গুজুর গুজুর কি হচ্ছিল? ওদের সঙ্গে আবার মানুষে কথা বলে!

বড় বৌ বলে, বলবো না তো কি? পাঁচটা হীরের আংটি নাকি আমরা ভোগা দিয়ে নিয়েছি। ছোট কর্তা অ্যাটর্নীর চিঠি দেবে বলে গিন্নী শাসিয়ে গেল। আমিই বা চুপ করে থাকবো কেন, বললুম যা পারিস করগে যা। কোর্ট তো খোলা আছে। ট্যাঁকের জোর কত দ্যাখা। মুরোদই যদি থাকবে তো কোবলার বাগান বেচছিস্‌ কেন?

বড়বাবু কিন্তু গিন্নীকে তারিফ করতে পারলেন না। ভ্রূকুটি করে বললেন, তাই বুঝি অ্যাটর্নী দেখালে?

ভায়ে ভায়ে কিছুতেই ভেবে পায় না জায়ে জায়ে কেন এত বাঁধন। কথায় কথায় কখনো-সখনো অন্তঃপুরে বলেও ফেলে।

পরের দিন জায়ে জায়ে রং মাখামাখি করে হাসাহাসি করে বলে, বাঁধন না হয়ে যায় কোথা? দুজনের যে একই কাঁদন।

॥ ১১ ॥

তারানাথ মারা গেল ॥

জলে ডোবেনি, আগুনে পোড়েনি, বিষ খায়নি, ছুরি মারেনি, অনাহারে থাকেনি, রোগে ভোগেনি, গুলি চলেনি, বোমা ফাটেনি, ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়েনি বা নিজেও পড়ে যায়নি তবু তারানাথ মারা গেল।

ফুটবল খেলা দেখতে মাঠে যায়নি, কোথাও কোনদিন রাজনীতি করেনি, দলবল নিয়ে ওয়াগন ভাঙেনি, গাড়ি চুরি করে ব্যাঙ্ক লুঠ করেনি, কোন জননেতার নাচুনিতে নাচেনি পর্যন্ত তবু তারানাথ মারা গেল।

কোন দিন টাকা চায়নি, চাঁদা তোলেনি, ট্রাম পোড়ায়নি, কাগজে লেখেনি, সভাপতি হয়নি পর্যন্ত তবু তারানাথ মারা গেল।

কোন দিন রেসে যায়নি, জুয়া খেলেনি, মদ গেলেনি, বক্তৃতা দেয়নি, পরস্ত্রীতে ঝোঁকেনি পর্যন্ত তবু তারানাথ মারা গেল।

পুরনো কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যেন মরেনি প্রমাণ করবার জন্যেই তারানাথ মারা গেল।

বাড়িতে পুলিস থেকে খবর দিয়ে গেল নৈহাটিতে তারানাথ রেলে কাটা গেছে। লাশ কলকাতায় চালান করেছে, পোস্টমর্টম্ হবে। পকেট থেকে মনিব্যাগ পাওয়া গেছে। মান্থলি টিকিট ও অন্যান্য কাগজপত্র ঘেঁটেঘুঁটে পুলিস তারানাথের পরিচিতি বার করে খবর দিয়ে গেল।

তারানাথ যে শুধু মারাই গেল তা নয়, সমস্ত পরিস্থিতিটাকে একেবারে ভণ্ডুল করে দিয়ে গেল। যেন মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া গোছের। দু-একদিন আগে-পিছিয়ে মারা গেলে মহাভারত কি অশুদ্ধ হত?

একটি মাত্র ছেলে আদ্যনাথ—তার আবার সেদিন বিবাহ। বরানুগমন সন্ধ্যা ছটায় সারতেই হবে, কেননা বিবাহের লগ্ন রাত্রি আটটা কত মিনিটে যেন। ছটা সতেরোর ট্রেন না ধরলেই নয়। বাড়ির পাশেই যে বিয়ে তাও নয়, বরযাত্রীদের দমদমায় এতখানি পথ যেতে হবে আবার সেদিন ফিরতেও হবে। তাদের সঙ্গে আর কিছু থাকুক আর নাই থাকুক ঘড়িটা আংটিটা বা বোতামটাও তো থাকবে। দিনকাল যা খারাপ। আর কোথায় চাকদা আর কোথায় দমদম?

আত্মনাথ তখন সেলুনে জুলপি ছাঁটাচ্ছিলো। বলল, এত সর্বনাশও মানুষের হয়? সব ভেস্তে গেল একেবারে। কি দরকার ছিল বাবাকে গোড়ের মালা টোপর কিনতে কলকাতায় পাঠাবার? চারটে হাত মিলিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত। আর উপেন বিপিন কুঞ্জলাল সব কি মরে ছিল? আর বাবাই বা নৈহাটিতে নামতে গেল কেন বুঝি না।

মুহূর্তের মধ্যে উৎসবের বাড়িতে বিপদের যবনিকা পড়ে গেল। বরযাত্রীরা শ্মশানযাত্রীতে পরিণত হবার যোগাড়।

অন্যেরা বলতে লাগল, এ পোড়া দেশে কি মালা টোপরও পাওয়া গেল না যে কোলকাতায় ছুটতে হল। ওকেই বলে নিয়তি! মালা টোপর নাই যদি পাওয়া যেত বিয়ে হোত না? পুরুত নাপিতকে মূল্য ধরে দিলেই হতো।

অন্দরে কান্নায় লাবণ্যপ্রভা ভেঙে পড়ল। আদু, বাপ আমার, তুই কোন্ রাক্ষসীকে আনতে যাচ্ছিস রে? সর্বনাশী আসার আগে থেকেই খেতে শুরু করে দিলে রে! ওরে কোথাকার সে সর্বনাশী রাক্ষসী ডাইনী রে? আদু, বাপ আমার, কি সর্বনাশ করলি রে? ওরে কি হল রে আমার?

মেয়ের বাড়িতেও খবর পাঠানো হলে সেখানেও একই দৃশ্য। গায়ে হলুদ দেওয়া মেয়ে, বিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। কি অলুক্ষুণে কথা! একেবারে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! হায় হায়!

আত্মনাথের দিকে ফিরে খানিক পরে মামাবাবু ও জেঠামশায় যুগপৎ বলে উঠলেন, যা হবার তা তো যথেষ্টই হল। ওদিকে বেলা তো পড়ে আসছে। তোমরা কোলকাতায় বেরিয়ে পড়ো এবারে। খোঁজ খবর করে পাত্তা তো করতে হবে যা-হোক।

সেই ছটা সতেরোর ট্রেন; আত্মনাথ উপেন বিপিন কুঞ্জলাল ট্রেন ধরতে স্টেশনে অপেক্ষা করছে। প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল ট্রেনের দেখা নেই। ইতিমধ্যে শিয়ালদহের ট্রেন এসে চাকদেহে যেন একবার বুড়ী ছুঁয়ে ছেড়ে যাবার উপক্রম করছে। ছুটন্ত ট্রেনের শব্দ জুড়িয়ে আসতে আসতে অপর দিকের প্ল্যাটফর্ম হতে তারানাথের গলা শোনা গেল, আদু, তোরা কি সব পাগল হয়ে গেলি নাকি রে! এভাবে এই সাজ-পোশাকে কেউ কোনদিন বিয়ে করতে যায়? ছেড়ে দে এ ট্রেনটা। সাতটা পাঁচের ট্রেনে গেলেই হবে। লগ্ন তো পর পর অনেক আছে আজকে, বরযাত্রীরা আর সব কোথায়? সোনা, মানা, ভুলো, কেষ্ট, বটব্যাল এরা সব কোথায়? যাবে ঠিক ছিল তো।

আমারও যেমন গেরো, যাবার সময় নৈহাটিতে একটা লোক কাটা পড়লো। হৈচৈএতে কখন যে আমার পকেট থেকে ব্যাগটা হাওয়া হয়ে গেল কিছু টেরই পেলুম না। পকেট কেটে গড়ের মাঠ। কলকাতায় পৌছেও আর এক জ্বালা। দেখি চতুর্দিকে গোলাগুলি। গণ্ডগোল, দোকানপাট, ট্রাম, বাস প্রায় সব বন্ধ। কি করি? হেঁটে হেঁটে গিয়ে এর ওর কাছে দু-চার টাকা করে চেয়ে-চিন্তে কেনাকাটা করতে করতে অযথা দেরী হয়ে গেল। কি কষ্টে যে এ ট্রেনটা ধরেছি ভগবানই জানেন। ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে যে এত ঝামেলা হয় কে ভেবেছে বল্?

সর্বশ্রী আত্মনাথের পাগল হতে আর বাকী কিছু যে ছিল না তারানাথ তখনও জানে না। জানল পরের দিনে।

পরের দিন বরবধূসহ চাকদহের তারানাথ কাগজে পড়ল গতকাল নৈহাটি স্টেশনে লাইন পেরোতে গিয়ে চাকদহের তারানাথ চক্রবর্তী রেলে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন। জোর পুলিসী তদন্ত চলছে।

প্রধান নবীনবাবু সদাহাস্যময়।

সারল্যের জীবন্ত প্রতীক। যদি কিছু তাঁকে বলা হয়—তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ তিনি শুনতে পান, বাকীটা শ্রুতিগোচর হয় না। যতটা শুনতে পান তার অর্ধেক তিনি বুঝতে পারেন, বাকীটা তাঁর বোধগম্য হয় না। যেটুকু বোঝেন তার অর্ধেকটার আবার তিনি জবাব দেন, বাকীটা উহ্য থেকে যায়। যেটুকু বলেন তার অর্ধেকটা বোঝা যায়, বাকীটার মানে কেউ ধরতে পারে না।

প্রাণধনবাবুর কালো টাকা নবীনবাবুর হাত দিয়ে সাদা করানো হচ্ছিল। যেন নবীনবাবু প্রাণধনবাবুকে টাকা ধার দিয়েছিলেন। নবীনবাবুর টাকা প্রাণধনবাবুর হাতে এসে ব্যবসায় খাটে—লাভ মুনাফা প্রফিট সংযোগে আয়তনে বৃদ্ধি পায়।

আয়কর বিভাগ ঝামেলা পাকিয়েছে। শান্তিপ্রিয় নবীনবাবুকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলছে। নবীনবাবুকে সাক্ষী দিতে হল—তিনি বললেন, "না, তা কেন? আমার কি সব সময়ই ট্যাঁকে টাকা থাকে যে চাইবা মাত্রই···আমি কি প্রাণধন? যে হুট্ বলতেই এক কথায় হাজার হাজার টাকা?"

কিন্তু নবীনবাবু বুঝেছিলেন তাঁর কাছে উকীলবাবু জানতে চান "এতগুলি করকরে নগদ টাকা? পঁচিশ হাজার টাকা—কোথায়ই বা পেলেন এতগুলো টাকা? আপনার কি সব সময়েই ট্যাঁকে হাজার হাজার টাকা থাকে?"

কিন্তু নবীনবাবু শুনেছিলেন তাঁকে প্রশ্ন করা হয় "কেন আপনি ক্রীক রোর প্রাণধনবাবুকে এতগুলো টাকা করকরে নগদ টাকা পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র একটি খাতার পাতায় লেখা হ্যাণ্ডনোটে ধার দিতে গেলেন বলুন তো? আর চাইবা মাত্রই কোথায়ই বা পেলেন এতগুলো টাকা? আপনার কি সব সময়েই ট্যাঁকে হাজার হাজার টাকা থাকে?"

কিন্তু নবীনবাবু প্রকৃতপক্ষে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা হচ্ছে এইরূপ: "আচ্ছা, এ পৃথিবীতে এত কোটি কোটি লোক থাকতে কেনই বা আপনি ক্রীক রোর প্রাণধনবাবুর জন্য বিগলিত হয়ে গিয়ে বেলেঘাটা থেকে ছুটে এসে এতগুলো টাকা, করকরে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র একটি খাতার পাতায় ছেঁড়া কাগজে

লেখা হ্যাণ্ডনোটে ধার দিতে গেলেন বলুন তো? সত্যি করে বলুন তো কেন আপনি ক্রীক রোর বাড়িটা বন্ধকও রাখলেন না বা হুণ্ডিতেও দিলেন না? প্রাণধনবাবু খালি হাতে চাইবা মাত্রই কোথায়ই বা পেলেন এতগুলি টাকা? আপনার কি সব সময়েই ট্যাকে হাজার হাজার টাকা থাকে?"

নবীনবাবুর সারল্যে প্রাণধনবাবুর প্রাণ বহির্গত হবার যোগাড় হল।

পর পর তিনটে শনিবার

পুঁটি হাবুলকে লেকের বেঞ্চিতে নিবিড় ভাবে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

প্রথম শনিবার ৭ই :

হাবুল বলে—কিচ্ছু না হলেও আমার ক্ষতি নেই। ফিল্ড তো সামনে আমার পড়েই আছে। কোন রকমে ল'টা একবার পাস করে নিয়েই ছ' মাসে একেবারে বিলেত-ফেরৎ ব্যারিস্টার। তখন আমার পয়সা খায় কে? কথায় বলে ল' মেডিসিন আর চার্চ।

পুঁটি বলে—গুড আইডিয়া, তাহলে আমিও বারে বেরোবো। তুমি হাসব্যাণ্ডের সাইডে দাঁড়াবে আর আমি ওয়াইফকে ডিফেণ্ড করবো। ওদের বাঁধন টুটবে যত মোদের বাঁধন শক্ত হবে।

হাবুল বলে—তা কেন? আমি ওয়াইফের সাইডে।

পুঁটি বলে—ভেবে দেখি।

দ্বিতীয় শনিবার ১৪ই :

পুঁটি —আমার যেন থেকে থেকে মনে হয় ডাক্তার হই। জাঁকিয়ে বসে প্র্যাকটিস করে দু হাতে পয়সা রোজগার করি। কেন জান? মামলা করেনি এমন লোকও থাকতে পারে। কিন্তু রোগে কখনও পড়েনি এমন নরনারী নেই। কি বল? একেবারে মনোপলি বিজনেস।

হাবুল —মন্দ বলোনি—বেটার আইডিয়া। আমিও ডাক্তার হয়ে যদি কোনরকম ফ্যামিলি প্ল্যানিং গোছের একটা নার্সিং হোম খুলতে পারি তো মার দিয়া কেল্লা। তখন গোছা গোছা নোটের বাণ্ডিল সরকার দেবে। মেল পেসেণ্টগুলি আমি দেখি—ফিমেলগুলি তোমায় দিই। একেবারে ডোমেস্টিক কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড।

পুঁটি —না না, মেল পেসেণ্টগুলি সব থাকবে আমার হাতে, আর—

হাবুল —আচ্ছা পরে বলবো

তৃতীয় শনিবার—২১শে :

হাবুল —ভেবে দেখলুম সিনেমায় নামাটাই বেস্ট আইডিয়া। একবার কোন-রকমে কষ্টেস্‌ষ্টে ঝিলিক মেরে উঠতে পারলেই বিচিত্রা সেনের সাথে হিরো-হিরোইন—হোয়াইটে যদি এক নি তো ব্ল্যাকে নেবো দুই।

খুঁটি —তুমি বলবে কি ছাই আমি কাল আমার ফটো পাঠিয়ে একটা দরখাস্ত অলরেডী করেই দিয়েছি। একবার যদি কোন রকমে চান্স একটা পেয়ে যাই তো তামাম হিন্দুস্থানকে পাগল করে নাচিয়ে দিই। ঐ-সরেশকুমারই তখন দেখবে ছবিতেও ছায়া হয়ে পিছু পিছু ঘুরছে আর বাস্তবেও কায়া নিয়ে সেই সরেশকুমার পিছু পিছু ঘুর-ঘুর করছে আর আমি তখন থালি ভ্রুকুটি করে বলছি যত সব অধম-কুমারের দল মরছে হ্যাংলামি করে সেই থেকে এক নাগাড়ে।

চতুর্থ শনিবার—২৮শে :

নায়ক নায়িকার আর দেখা নেই। হয় প্রেম টুটে গিয়েছে, কেন না লাভ ইজ জেলাস্—না হয় তো পুলিসে ধরেছে, কেন না অশালীনতা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী।

ডক্টর ইন্দ্রনীল চৌধুরী সিগার ধরালেন।

বললেন, বুঝেছো রেণুলা, ভিয়েনাতে আমি চিঠিচাপাটি করে ব্যবস্থা একরকম সব পাকাপাকি ক'রে ফেলেছি—আর অমত কোরো না। মাস কতকের ব্যাপার তো!

স্ত্রী রেণুলা বললেন, না না, ওকথা তুমি আমায় বোলো না—আমি যে ও জিনিসটা ভাবতেই পারি না। আমার কোন কিছুই অসুবিধা হচ্ছে না—তুমি তো কোন কষ্টেই রাখনি আমাকে। তোমার একটা চোখ তুলে, ছিঃ ছিঃ, আমি ভাবতেই পারছি না। তুমি অন্য কথা বল, আমার সঙ্গে গল্প কর, আমার গান শোন, আজেবাজে কথা বোলো না। আমার আর একটু কাছে স'রে এসে বস খানিকটা।

কি আশ্চর্য, আমি নিজে ডাক্তার হয়ে তোমায় বাজে কথা বলছি? এ অপারেশন সেখানে ডালভাত। আমি নিজেই তো সে হাসপাতাল দেখে এসেছি, এখন এতাদিনে না জানি আরও কত উন্নতি হয়েছে। ডক্টর হ্যারল্ড ডারবিসায়ার সেখানে এখনও আছেন।

আমায় আর যা করতে বলবে আমি সবেতে রাজী; তোমার একটা চোখ নিয়ে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাব। নাই বা পেলুম এমন দৃষ্টি। একি আমি রাজী হ'তে পারি? তা হয় না, কিছুতেই না।

ছেলেমানুষী কোরো না রেণু, এতটা এগিয়ে আর পেছোনো যায় না, আমারও তো একটা পজিশন আছে।

রেণুলার অন্ধ চোখে বারিধারা নামল। ডাক্তার পুনরায় শুরু করলেন, তা ছাড়া ধরো, আমি কেমন লোক, আমায় কি দেখতেও ইচ্ছে যায় না তোমার একবার এ জীবনে।

না না না, তোমায় দেখতে একটুও ইচ্ছে হয় না আমার, আজ পাঁচ বছর তোমাকে দেখেছি যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, প্রতিটা ইন্দ্রিয় দিয়ে যা অনুভব করেছি, চোখ মেলে তোমায় দেখতে না পেলেও কোন অনুতাপ নেই, অনুশোচনা ক্ষোভ খেদ দুঃখ অশান্তি কিছুমাত্র নেই আমার। আমি আশার অতিরিক্ত সুখেই আছি,

ভগবান এটাই যেন টি'কিয়ে রাখেন, বলে রেণুলা স্বামীর বুকে মুখ লুকাল। বলল, আর একেবারে যে দেখিনি তা তো নয়—আট বছরের মেয়ে তো তখন আমি, সবটা ভুলে যাবোই বা কেন ?

পাঁচ বছর আগেকার ঘটনাটা এখানে বলে রাখি। এ পৃথিবীতে এর চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা বোধহয় ইতিপূর্বে ঘটেনি, অনেকে তাই বলে, বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার ছেলে ইন্দ্রনীল, যেমন কন্দর্পকান্তি চেহারা তেমনি মিষ্টভাষী তেমনি কৃতী পুরুষ। দু হাতে টাকা কামাতে শুরু করেছে, সুনাম যশ বাড়ি গাড়ি কিছুরই অভাব ছিল না। তুঙ্গে বৃহস্পতি যেন। এমন ছেলে, সে কিনা বিয়ে করলে একটা কানা মেয়েকে! অতি সাধারণ গেরস্ত ঘরের মামার বাড়িতে মানুষ মেয়ে, মেয়ের না ছিল রূপ না ছিল বাপের রুপো। ছেলেটার মাথাফাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ; আপনজনেরা বলাবলি করতে লাগল। এমন কি কদরের মেয়ে যে কানা খোঁড়া হলেও বিয়ে করতে হবে? অমন ছেলের এমন বৌ? ছেলে থাকে বালীগঞ্জে, মেয়েরা পাকপাড়ায়। জানাজানি আলাপ পরিচয় হওয়ারই বা সম্ভাবনা কোথায়। কোথা থেকে কোথা! কি থেকে কি। সবই ভবিতব্য। এ ছাড়া ছেলের সম্বন্ধে আর কিছু বললেও কেউ বিশ্বাস করত না। বলত, না না, ওসব বাজে কথা।

কিন্তু এই অসম্ভব ঘটনাও সেদিন সম্ভব হয়েছিল। ইন্দ্রনীলই নিজে লোক পাঠিয়ে ঝামাপুকুর থেকে এন্টালী, এন্টালী থেকে পটলডাঙ্গা, পটলডাঙ্গা থেকে পাকপাড়া অনেক খোঁজখবর করে মেয়েকে বার করে।

পিতৃবন্ধু ক্ষেত্রনাথবাবু ছাড়া ডাক্তারের তরফে আর কেউ ছিলেন না। সুতরাং ক্ষেত্রনাথবাবুকে মেয়ের মা নিভাননী দেবীর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলতে হয়। মেয়ের মা সমস্ত শুনলেন বটে কিন্তু সবটা যেন বুঝলেন না। যেটুকু বুঝলেন সেটুকুও যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। যতটুকু বিশ্বাস করলেন প্রাণ খুলে যেন সম্মতি জানাতে থতমত খেয়ে গেলেন। বললেন, ছেলে নিজে মেয়ে দেখুক। আমার মেয়ে কানা মেয়ে, ছেলে কি তা জানে? ছেলে নিজে দেখে রাজী হলে আমার সঙ্গে কথা বলুক। আমার যেন কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না ক্ষেত্রবাবু, জিনিসটা যেন কেমন কেমন ঠেকছে। বলছেন রাজপুত্তুরের মতন চেহারা, বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার, রোজগারপত্র ভাল। সে ছেলে কেন আমার কানা মেয়েকে বিয়ে করতে যাবে বলুন? আপনি যা বলছেন আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি দয়া করে ছেলেকে একদিন আসতে বলুন। আমি বলেছি বলুন।

ইন্দ্রনীলকেই বাধ্য হয়ে নিভাননীর সঙ্গে দেখা করতে হল। এসে বলল, মেয়ে আমার বহুদিন আগে থেকেই দেখা আছে। আমি সবই জানি, জেনেশুনেই এগিয়েছি।

নিভাননী বললেন, কতটা জান জানি না, তবু আমি কিছুটা বলতে চাই। মা হয়ে কিছুই গোপন করতে চাই না। শোন, আমার ঐ একটিই সন্তান কানা মেয়ে, জন্মান্ধ নয়।

হ্যাঁ, জানি, তখন ও আট ন' বছরের ফ্রকপরা মেয়ে।

নিভাননী বললেন, একদিন কালীপূজার সন্ধ্যায়···

ডাক্তার বলে, তখন আপনারা ঝামাপুকুরে রেবতীবাবুদের ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতেন, আমাদেরই বাড়ির দু-চারখানা বাড়ির তফাতে।

হ্যাঁ, করালীবাবুর বাড়ি থেকে—করালীবাবু পুলিস কোর্টের উকীল ছিলেন—একটা হাউই এসে রেণুর মুখে আছড়ে পড়ে। মাগো বলে রেণুমা সেই যে চোখ দুটি বুজলো আর সে চোখ খোলা গেল না। দৃষ্টিশক্তি চিরকালের মতন নষ্ট হয়ে গেল।

জানি, দেওয়ালীটাই দুঃখের দেওয়ালী হয়ে গেল। ওর জীবনে দাগী দেওয়ালী হয়ে রইল।

নিভাননী বলতে লাগলেন, রেণুলা আমার তখন ছাদের পাঁচিলে পিদ্দিম দিচ্ছিল, ঝোড়ো হাওয়ায় কিছুতেই জ্বালাতে পারছিল না। কেন জান? অমাবস্যার কালিমা তার জীবনে চিরদিনের জন্য যে কালি ঢালতে আসছে তারই পূর্বাভাস।

জানি, হাউইটা হঠাৎ বেঁকে গিয়ে কেমন করে আপনাদের ছাদের দিকে গেল! আশ্চর্য, যাওয়ার কথাও নয়!

রেণুলা কিন্তু শুনেছিল করালীবাবুর ভাগ্নে ইন্দির নাকি তাকে ডেকে বলেছিল, রেণু হাউইটা কেমন ছুঁড়ছি ছাখো। অবশ্য করালীবাবু পরে কথাটা উড়িয়ে দিলেন। রেণুলার বাবা কোর্টঘর করেছিলেন বটে, প্রমাণের অভাবে কিছু ফল হ'ল না। করালীবাবু প্রমাণ করিয়ে দিলেন তাঁর ভাগ্নে ইন্দ্র সেদিন পাটনা থেকে আসেইনি।

দেওয়ালীতে পাটনায় সেদিন তুবড়ী কমপিটিশনে ইন্দ্র ফাস্ট হয়েছিল। করালীবাবুর বাড়িতে আর কোন ছেলেপুলেও নেই। বাজি ছোঁড়া তো দূরের কথা, সেদিন রাত্রে তাঁদের ছাদে কেউ ওঠেওনি।

হ্যাঁ, মামা পুলিস কোর্টের উকীল তো। আমি সেদিনই বিকালে পাটনা থেকে এসেছিলাম ঠিকই। মামা ঘটনার পরেই আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিলেন। রেণু ঠিকই শুনেছিল ইন্দ্রই হাউই ছোঁড়বার আগে রেণুকে ডেকে দেখাচ্ছিল।

তুমি এত কথা কি ক'রে জানলে, কিছু তো বাবা বুঝতে পারছি না। আমার সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। তুমি কি কখনো চোখের ডাক্তার ছিলে? রেণুলাকে কি কখনো তোমার কাছে দেখানো হয়েছিল? ওর বাবার কাছে কিছু শুনেছিলে বুঝি?

না, না, কখনোই আমি কারোর চোখের চিকিৎসা করিনি। আমিই সেই ইন্দ্র, করালীবাবুর ভাগ্নে, পাটনার ভাগ্নে আপনাদের কাছে দোষ স্বীকার করে মার্জনা চাইতে এসেছি। আমি অনুতপ্ত, আমিই ওর দৃষ্টি নষ্ট করেছি, আমিই ওর ভার বহন করতে স্বেচ্ছায় অগ্রণী হয়েছি। কেবল আপনার সম্মতির অপেক্ষায়। করালীবাবুর মৃত্যুর পরে আমি আর আসিনি। পূর্বে যা দু-চারবার এসেছিলুম, আপনাদের খবর নিয়েছিলাম, তখন আপনারা অন্যত্র উঠে গেছেন।

হ্যাঁ বাবা, উঠে না গিয়ে তো উপায় ছিল না। রেণুলার বাবা সেই থেকেই কি রকম হ'য়ে গেলেন। খালি বলতেন এত বড় সত্য প্রমাণ হল না। সত্যের জয় তাহলে হয় না দেখছি। এই অন্ধ মেয়ে নিয়ে আমি এখন করি কি? মেয়ের বাপ হয়ে এ আমার কি সাজা দিলেন ভগবান আমাকে? অহরহ এই চিন্তাই তাঁকে কাবু ক'রে ফেললে। বছর খানেক মাত্র বেঁচে ছিলেন। খুব চিন্তাক্লিষ্ট হয়েই তিনি গেছেন। তার পরে মেয়েকে নিয়ে আমি দাদার কাছে এসে উঠি। দাদার মতন দাদা আমার। কখনও একটা কথা বলতে শুনিনি। ঝামাপুকুর থেকে বাড়ি বদলে এখন পাকপাড়ায় এসেছি। লাইফ ইন্সিওরেন্সের যা কিছু টাকা পাই দাদা সেই দিয়ে এই বাড়িটা কিনে একটা হিল্লে করে দিলেন। কিছুটা ভাড়া দিয়ে মায়ে-ঝিয়ে কষ্টেসৃষ্টে কোনরকমে দিন কাটাচ্ছি। আমাদের এই হ'ল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

নিভাননীর চোখে জল এসেছিল। তিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে ডাক্তারের দিকে চাইলেন।

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ মা, আমি সমস্ত জেনেশুনেই এগিয়েছি। শুধু কেবল আপনার সম্মতি পাওয়ার প্রত্যাশায়। রেণুলাকে আমার বলা হয়ে গেছে।

নিভাননী আঁচলে চোখ মুছলেন, বললেন, এখন মনে হচ্ছে সত্যের জয় হয়ই— কিছুটা আগে বা কিছুটা পরে।

ট্রাম অনেকক্ষণ থেমেছিল।

হঠাৎ ভারী বৃষ্টি হওয়ায় পথে হাঁটুভর জল। রাস্তায় নামা সম্ভব নয়।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, আপনিই কি মনমনবাবু? মানে মনমোহন ভট্চাজ?

আমার পাশের ভদ্রলোক বললেন, না না, আমার নাম ত্রিপুরারী কর, কর রায়।

ও, আপনি এখন কি ডায়মণ্ডহারবারে থাকেন না?

দ্যুৎ, আমি পায়রাডাঙ্গা থেকে যাতায়াত করি, রাণাঘাটের আগের স্টেশন এধারে।

তাই বুঝি? আপনার বাবার নাম তো ললিত ভট্চাজ? বেঁচে আছেন?

তা কি করে হবে? আমার বাবার নাম ঈশ্বর ত্রৈলোক্যনাথ কর রায়, কবে মারা গেছেন! সে আজকের কথা?

তাই তো, মারা গেছেন বললেন! গত বছর বেলেঘাটায় আপনি বাড়ি কিনেছেন তো? সত্যবতীর নামে?

বললুম তো পায়রাডাঙ্গা থেকে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করি। সত্যবতী কে? জানি না।

তাই নাকি? কেন, ভুবনবাবুর স্ত্রী? ভুবন ধর? আপনার কে হন?

কোন্ ভুবনবাবুর কথা বলছেন, চিনলুম না। আমাদের বাড়ির সামনে এক ভুবন থাকে; ভুবনবাবু তাকে বলতে পারেন। কিন্তু সে তো ছাগলের দুধ বেচে। আমার জানা লোক।

ভাল কথা, তা বাড়ি কেনার টাকা পেলেন কোথায়? কি করেন আপনি?

টাকার চেষ্টায় ঘুরছি। উপস্থিত একটা স্কুলে চাকরি করি। মাস্টারী নয়—পেটে বিদ্যে নেই। লটারীর টিকিট মধ্যে মধ্যে কিনি। টাকা পাইনি এখনও। পেলে বাড়ি গাড়ি সব কিনবো মনে করছি।

হঠাৎ দাড়ি রাখলেন?

আমার ইচ্ছে। ভারতীয় সংবিধানে তো বাধা নেই।

তা বাংলাদেশে পালিয়ে গেছেন কেন ?

কে বললে ? আমি কি পূর্ববঙ্গের ! কথাবার্তায় বোঝেন না ? টান্ আছে ?

কেন ? আমি বলছি—পালিয়ে আছেন এক বছর। তবে মধ্যে মধ্যে সত্যবতীর কাছে আসা-যাওয়া করেন শুনি।

বোগাস ! গত বছরে ঘাটশিলায় গেছলুম। সে কি এখন বাংলাদেশে পড়ে নাকি ? কিন্তু আপনি কে মশায় ? এত অনুসন্ধিৎসাই বা কেন ? হাঁড়ির খবর চান ?

বলছি বলছি। সব জানতে পারবেন। একটা সিগারেট খান, ট্রাম তো এখন থেমে আছে। খাওয়া চলে।

খাই না, থ্যাঙ্কস্।

তা প্লাস্টিক সার্জারী করে ভোল তো ফিরিয়েছেন খুব। ঠোঁটকাটা তো আর নেই।

ঠোঁট আমার বরাবরই এই রকম। কাটাও ছিল না, ফাটাও ছিল না।

বটে ! চোখের ভ্রূ নাচানো মুদ্রাদোষটা কিন্তু বদলাতে পারেননি। তাতেই আপনাকে মেরেছে।

ভদ্রলোক উঠতে চেষ্টা করলেন কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হলেন।

এখন গগল্স্টা পরেছেন কেন ? ভুরুটা ঢাকবার জন্য ? সন্ধ্যারাত্রিতে কে আবার গগল্স্ পরে ? খুলে ফেলুন। বলে প্রশ্নকর্তা এক ঝটকায় ভদ্রলোকের চশমা টেনে নিলেন।

ট্রামসুদ্ধ লোক যাঁরা এতক্ষণ নির্বাক দর্শক বা শ্রোতার ভূমিকায় ছিলেন, একটু যেন চনমনে হয়ে উঠলেন। এতটা বাড়াবাড়ি যেন ভাল নয় এই গোছের ভাব। বৃহত্তম গণতন্ত্রে একক ব্যক্তিস্বাধীনতাকে যেন টুঁটি টিপে মারা হচ্ছে।

মৃদু গুঞ্জন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নকর্তা বললেন, এইবার সব কথা একে একে বলি, শুনুন। আপনার নাম সুধীর বিশ্বাস। চিৎপুরে একটা গলির ভিতরে থাকেন। আপনার বাবার নাম অধীর বিশ্বাস। আজ জীবিত আছেন কিনা জানি না, কিছুদিন আগেও জীবিত ছিলেন। গত বছরে লেক টাউনে পঁচাশি হাজার টাকায় বাড়ি কিনেছেন, উষারাণীর নামে। ঐ উষারাণী হলেন দমদমার দীনেনবাবুর স্ত্রী, আপনি ফুসলে বার করে এনেছেন। দীনেনবাবু মাতাল লোক, কিছু টাকা তাঁকে দিয়ে মুখ বন্ধ করেছেন। বাড়ি কেনার টাকাটা হচ্ছে

কাঁকুড়গাছি ব্যাঙ্ক লুটের টাকা। দাড়ি রেখেছেন, ভেবেছেন চেনা যাবে না। যশোহরে পালিয়েছিলেন ধরা যাবে না বলে। উষারাণীর কাছে আসেন কারণ সে কলকাতা ছেড়ে যেতে চায় না বলে। প্লাস্টিক সার্জারীতে ঠোঁটকাটাটা বেমালুম সারিয়েছেন তবে ভুরু নাচানোটা আপনার মুদ্রাদোষ, কিছুতেই বদলাতে পারলেন না। ব্যাঙ্ক লুটের পরে টেরিটি বাজারে ধরা পড়েন। থানার হাজত থেকে সরে পড়েন। কেমন, তাই না? গত বছরের আগের বছর এই টাইম বরাবর? কি? ঠিক বলেছি তো? আর আমার কথা শুনুন, আমি সাদা পোশাকে পুলিসের লোক। আপনার সন্ধানে ঘুরছি কিছুদিন যাবৎ। পরশুদিন ধর্মতলায় দাঁড়িয়ে যখন ফুচকা খাচ্ছিলেন মাথায় পাগড়ি বাঁধা ছিল।

ভদ্রলোক কিছু বলতে গেলেন কিন্তু পারলেন না, তোতলালেন আর সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নকর্তা বললেন, চলুন, আর কতক্ষণ জলে আটকে থাকবেন? ভ্যানে যাই চলুন।

গণতন্ত্রের জনগণ, আমাদের কিছু করার ছিল না। চুপচাপ ট্রামে বসে থাকার বিরক্তিটা যেন ক্ষণিকের নাটকে কিছুটা হাল্কা হল।

॥ ১৬ ॥

ডাবলিউ ডাবলিউ কে ফ্র্যাংকলীন—

মানে উইলিয়াম উড্‌স্‌ওয়ার্থ কিংসওয়ে ফ্র্যাংকলীন।

রিপন স্ট্রীটের মিস্টার ফ্র্যাংকলীন ; সাহেব হলেও দেহের রং তাঁর কয়লা আর মনের রং তাঁর ময়লা। তবে যদি বলেন তাহলে আবার সাহেব কিসের ? জবাবে বলব, হ্যাঁ, তা বটে, তবে তাঁর পোশাক-আশাক আদব-কায়দা চলন-বলন কোন অংশেই ন্যূন নয়। বাজারেও যে নামডাক মোটেই সুবিধার নয় ইদানীং তাও কানে এসেছিল।

মাল বেচেছিলাম, দাম পাইনি। হাজার টাকা পাওনা, প্রায় তিন বছর ঘোরাচ্ছে, তামাদি হয় হয়।

সেদিন ঈষদুষ্ণ কয়েকটা কথা শোনাতে গিয়ে নিজেই শুনি, বাবু, তোমরা বেঙ্গলী পিপল, ব্যাবসার এ-বি-সি বোঝ না, ব্যাবসা গোসা করবার কারবার নয় বাবু, বিজনেস ইজ বিজনেস, ক্লায়েণ্ট হচ্ছে তোমার গডেস লছমী। আমি নামেও ফ্র্যাংকলীন, কাজেও ভেরী ফ্র্যাংক।

কিছুটা রাগত ভাবেই বলি, তা বলে মাত্র হাজার টাকা! পাওনা টাকা, তিন তিনটে বছর ঘোরাচ্ছো কেন ? আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, ইস্‌ তিস্‌ নানা ছুতোয় খালি যাচ্ছি আর আসছি তোমার দরজায়, আমার অন্য কোন কাজ নেই ?

সাহেব হেসে বলে, বসো বাবু, হ্যাভ এ কাপ অফ কফি প্লিজ্‌! টাকা পড়ে থাকে না কার আবার ? টাটা বিড়লা ক্যাশে কাজ-কারবার করে ? জান তো নাম আমার ফ্র্যাংকলীন, কাজেও আমি ভেরী ফ্র্যাংক।

বলি, বড় বড় কথা ছাড়ো, তিন বছর হতে চললো দাম বাকী। উকীলবাবু বলেন ও আর আদায় হয়েছে। কোর্ট-কাছারী না করলে টাকা ডুবলো।

সাহেব পুনরায় হেসে বলে, কোর্টঘর করে কি নাফা হবে ? কি প্রমাণ করবে তুমি বাবু! বলেছি না ফ্র্যাংকলীন নামও যেমন আমার, কাজও তেমন ভেরী ফ্র্যাংক।

কি প্রমাণ করব ? কেন চালানের কপি ? বিল সই করে নিয়েছে,

বিলকভারে সই ?

ও তো দত্তগুপ্তর সব সই, ফ্র্যাংকলীন সদাসর্বদা কাজে ভেরী ফ্র্যাংক, দত্ত এবং গুপ্ত আর টু সেপারেট ব্যক্তি। কোনদিনই দত্তগুপ্ত বলে কোন লোক আমার কাছে কাজ করেছে রেকর্ডে প্রমাণ হবে না। লীভ্ দ্যাট্ অ্যাসাইড বাবু, কোন বিজনেসম্যানই কোর্টফোর্ট পছন্দ করে না। টেক এ চেক টোডে, আরও কাজ করো, অ্যাপ্লাই ইয়োর মাইণ্ড টু বিজনেস বাবু। কত টাকা পাবে বল, চেক দিয়ে দিচ্ছি, আমি এখুনি এয়ারপোর্টে যাচ্ছি, বম্বে থেকে ফিরতে দেরী হবে। পরে ঘড়ি দেখে বলে, ওহো, আজ শনিবার, আচ্ছা ভেরী ওয়েল, মানডে ফার্স্ট আওয়ারে জমা দেবে। তবে আজ কিন্তু আবার বেশী করে মাল পাঠাবে, ভুলবে না। কত অ্যামাউন্ট প্লিজ ?

সুর নামিয়ে বলি, হাজার টাকা—সুদ ছেড়ে দিলাম—সমুচা সুদ ছাড়লুম—চেকটা বেয়ারার চেক দিলে ভাল হয়।

ভেরী ওয়েল বাবু। ফ্র্যাংকলীন যার নাম কাজ তার কি ভেরী ফ্র্যাংক না হয়ে যেতে পারে। নিয়ে যাও তোমার চেক। বলে খসখস করে চেক লিখে দিল।

নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। হ্যাঁ চেকই বটে, আমার নামেই বটে, টাকাও এক হাজার বটে, বেয়ারার চেকও বটে, সইও তো ফ্র্যাংকলীনেরই বটে। হলেই বা সোমবারের ফার্স্ট আওয়ারে—নগদ হাজার টাকা হাতে আসছে। তবু—তবু সবটা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এতটা কি হবে ? কি জানি, হবেও বা, আমরা বেঙ্গলী পিপল ব্যবসার এ-বি-সি বুঝি না।

সোমবার সকালেই ব্যাঙ্কে হাজির হয়ে কাউণ্টারে চেক না দিয়ে সরাসরি ব্যাঙ্ক অফিসারের সঙ্গে দেখা করে বলি, সাহেব তাড়াতাড়িতে এই চেকটি কেটে বম্বেতে চলে গেছেন আর বলে গেছেন আপনার কাছে জেনে নিতে অ্যাকাউণ্টে টাকাটা আছে কি না, কত আছে সাহেবের মনে ছিল না অথচ রেসপেকটেবল পার্টিকে নগদ দিতে হবে। কারবারের বদনাম না হয়ে যায়, যদি কাইণ্ডলি—

বাকীটা বলতে হল না। অফিসার আমার দিকে তাকালেন কিন্তু সন্দিগ্ধ হতে পারলেন না। পরে খোঁজ নিয়ে জানালেন, হিসাবে মাত্র ৯৬০ টাকা আছে এ চেক ভাঙানো যাবে না। এটা হাজার টাকার চেক।

ব্যাবসার বাজারে সাহেবের নামডাক কেন যে সুবিধার নয় বুঝতে পারলাম। পকেটে কিছু টাকা ছিল, বাইরে কাউণ্টারে সাহেবের অ্যাকাউণ্টে আমার পকেট থেকে ৫০ টাকা জমা দিয়ে দিলাম। অবশ্য জিজ্ঞাসিত হলে বলতাম পার্টির কাছে

ফার্মের নাম তো খারাপ হতে দিতে পারি না।

ঘণ্টাখানেক উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সময় কাটিয়ে এসে সাহেবের হাজার টাকার চেকটি দাখিল করতে কোন বাধাই পেতে হল না, অনতিবিলম্বে নগদ হাজার টাকা হাতে এল।

প্রায় ডোবা টাকা টেনে তুললাম ভেবে পঞ্চাশ টাকার শোক আদৌ পাই-নি। তবে কেউ যখন বলেন তবু তো পঞ্চাশ টাকার ঘা খেলে। তাকে বলি আমরা বেঙ্গলী পিপল, ব্যাবসার এ-বি-সি বুঝি না যে!

॥ ১৭ ॥

কেবল রবিবারেই বাজার যাই।

একদা এক রবিবারে হাতিবাগান বাজারে গিয়েছিলাম ট্যাংরা মাছ কেনবার জন্য। বেশ বড় সাইজের জ্যান্ত মাছ দশ টাকা কেজি। পাঁচশো গ্রাম কিনতেই পাঁচ টাকা হারাব কিনা ভাবছি, পাশে একটি ছেলে এসে দাঁড়াল। হাতে খাঁচায় একটি পাখী দেখলাম। কোকিলই বটে। বলল, বাবু, পাখী নেবেন? খাঁচা সুদ্ধ পাঁচ টাকা দিন। দিতাম না বাবু, পোষা পাখী, মায়ের অসুখ, ডাক্তার ডাকবার টাকা নেই।

দ্রবীভূত হয়ে গেলাম, ভাবলাম, পুরনো খাঁচা হলেও পাখী সমেত পাঁচ টাকা, অন্যায় নয়। বললাম, ডাকে তো?

ছেলেটা মাথাটা অনেকটা হেলিয়ে দিল। ট্যাংরা মাছের পরিবর্তে কোকিল পাখী নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকি, এক চিলতে বারান্দায় খাঁচাটি টাঙানো হল।

পাখীর ডাকে গোটা বাড়ির বিশ ঘর বাসিন্দা অস্থির হয়ে গেল।

এ পাশের ফ্ল্যাটের বামুন বৌ চেঁচিয়ে বললেন, এ আপদ আবার হাড় জ্বালাতে কোত্থেকে জুটলো?

ও পাশের মহিমবাবু বলেন, বুড়ো বয়সে একি উৎকট শখ বাবা বুঝি না। কোকিল কূজন শুনবি তো ঘরে বন্ধ করে রাখ্, কি নিজে বিজন বনে চলে যা—একি জ্বালা!

নীচেকার রমেন বলে, পড়ার ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে স্যার, একে রাত জেগে পড়ি তায় কানের কাছে সারারাত ঝালাপালা—

খাকোর মা বলেন, ছেড়ে দাও না বাছা, সকলকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাচ্ছে, ভাল হচ্ছে?

খ্যাঁদা বলে, শখকে বলিহারী বাওয়া!

পাখীটার খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি, ঘরে এনে রেখেছি চাঁদিনী রাতে, পুরনো ছাতার কাপড় দিয়ে খাঁচা ঢেকে দিয়েছি তথাপি কোকিল-কাকলী থামানো গেল না, কমানোও গেল না।

বদ্যিনাথ বলে, আজ যদি আমার ঘুম না হয় তো ইট ছুঁড়বো, পাখী পোষা ঘুচিয়ে দেবো জন্মের মতন।

শেফালী বলে, মাসীমা, আপনাদের দেখছি সব ঋতুই বসন্তকাল আর দিনদুপুরেও চাঁদের আলো। আছেন বেশ!

বাঁটুল বলে, চেঁচিয়ে গলার শিরও তো কই ছেঁড়ে না? বাপ্‌স্‌ কি চেঁচায় রে!

বাড়িওলার দরোয়ান বলে, চিঁড়িয়া শালা হারামি হ্যায়।

উপরের বৃদ্ধ জানকীবাবু হাঁপানী রোগী। সারারাত ঘুমুতে পারেন না। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হয়। রাত্রে কাতর কণ্ঠে মেয়েকে বলেন, ওরে তিনু, ত্যাখ্‌ মা আবার পাখীটা ডাকছে, একটু তন্দ্রা এসেছিল, ঘুচে গেল সব। বলে কাশতে শুরু করলেন।

পরের রবিবারে বালক ভৃত্যকে নিয়ে সেই বাজারেই খাঁচা সমেত পাখীটা নিয়ে গেলাম। হরিয়াকে সব শেখানো পড়ানোই ছিল। অল্পক্ষণে খরিদ্দার জুটে গেল। নিষ্কৃতি পেলাম।

এইবারে পাঁচ টাকায় পাঁচশো গ্রাম বড় সাইজের জ্যান্ত ট্যাংরা মাছ কিনে আনলাম। হরিয়াও ভাগ পেয়েছিল।

অফিসে বন্ধুবরের কাছে সেই কথা বললে জবাব পেলাম, ভালই করেছো, তোমার মতন অপদার্থ লোকের এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার একমাত্র সার্থকতাই হচ্ছে কেবল একটা ভদ্রলোকের মেয়ে তবু মধ্যে মধ্যে মাছ ভাত খেতে পায়। আর কিছু না।

উঁয়া, উঁয়া, উঁয়া

দেখি ধরাধামে এক নূতন অতিথির প্রথম পদার্পণ। নবকুমার এল কিন্তু কাঁদে কেন! ভবযন্ত্রণার কানাঘুষা আগে থেকেই কিছু জেনেছে বুঝি! তাই কি এই বিলাপের করুণ আর্তনাদ!

অনতিদূরে আপনজনেরা দাঁড়িয়ে;—তাদের হাসি তো আর ধরে না দেখছি। ঐ যে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো হাস্যময়ী প্রৌঢ়া—শিশুর ঠাকুরমা কি দিদিমা বোধহয়—পাশে নিশ্চয়ই তার ঠাকুরদা বা দাদামশায়। ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে একগাল হেসে বলে, শালার গলা তো খুব!

পাশ থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে এক কিশোরী, মাসি-পিসি পর্যায়ে পড়ে হয়তো। বলে, কিরকম চোখ পিট্‌পিট্ করছে ছাখো মা; ওর ডিমপল্ নাম রাখবো কিন্তু।

হাসির হাট বসে গেছে যেন। লাঙুলহীন শৃগালের দল সব আর একজনের লাঙুল কাটা গেল দেখে খুশীতে ডগমগ।

ডাক্তারবাবু এখনও অ্যাপ্রন পরেই আছেন। ডেটলের গন্ধে বাতাস ভরপুর। ডাক্তারবাবু হাত ধুতে ধুতে বলেন, ওয়েটটা দেখে নিন সিস্টার।

নার্স ধুইয়ে মুছিয়ে তোয়ালেতে করে শিশুকে প্রৌঢ়ার হাতে তুলে দিয়ে বলে, নিন, সোনার চাঁদকে কোলে নিন। 'ক চুল—যেন রাজপুত্তর!

মনে মনে বলি, হ্যাঁ, সোনার চাঁদ তো বটেই যেহেতু চকচক করছে সেহেতু নিশ্চয়ই সোনা—নিশ্চয়ই বাইশ ক্যারেটের, আমার কি? সোনাই হোক আর পেতলই হোক আমার কুষ্ঠীতেও রাজযোগ ছিল। রাজা হওয়া তো দূরের কথা, গভর্ণমেণ্টের চাকরিও পাইনি। মরুক গে, এলিয়ে পড়লাম, দৃষ্টি উর্ধ্বমুখী হল।

দেখি ঘরে দুজন নার্স রুগীকে ঘিরে আছেন আর আছেন সর্বাপেক্ষা বড় সার্জেন ডাক্তার অনুপকুমার তালুকদার—শহরজোড়া যার নাম—বললেন, আর অক্সিজেন কেন? স্যালাইনও সরিয়ে নাও। হার্ট বিটিং থেমে গেছে, পাল্‌স্ পাওয়া যাচ্ছে না, দি এণ্ড, আবার কি! নাউ লেট আস গো, ঘিরে দিতে বল হে। মেট্রন কোথা?

ছোট ডাক্তার বলেন, বাট অপারেশনস সাকসেসফুল স্যার?

নো ডাউট, ওপোন করেও তো রোগ ধরা গেল না।

এক পা এক পা করে বাইরে এসে মৃতের আপনজনেদের দিকে চেয়ে মন্তব্য করেন, কিছুতেই পেসেণ্ট রেসপণ্ড করল না। কি করা যায় বলুন। উই আর নট গড, ক্যান ট্রিট্ দি অ্যালাইভ নট দি ডেড্।

চাপা ক্রন্দনধ্বনিতে ঘরের হাওয়া ব্যথিত হয়ে উঠল।

মৃতের মুখ বেশ প্রফুল্লই ছিল। জীবনের ছুটির শেষ ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরমন্দির থেকে যাবতীয় রোগবীজাণু গ্লানি ক্লেদ অবসাদ যন্ত্রণা ও মলিনতা মৃতকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে তার মুখে অফুরন্ত হাসি যেন ফুটিয়ে দিয়ে গেছে।

হাসি পায় আমারও। বলি, মরতে আর জায়গা পেলে না, মরেও গেলে, টাকারও শ্রাদ্ধ হ'ল। একফোঁটা জলও পেলে না, শরীরটাকে ছিঁড়েফেঁড়ে কি না করলে। ইস্, নিয়তি আর কাকে বলে! কেমন বললে উই ট্রিট দি লিভিং নট দি ডেড্। কেন, বললেই তো পারতো উই ট্রিট্ দি লিভিং টিল্ ডেড্। তবু ভদ্রভাবে হতো।

দৃষ্টি নতমুখী হল। দেখি অজস্র ফুলের গোছা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চোখ-ধাঁধানো মূর্তিতে হাস্যময়ী লাস্যময়ী সিস্টার লীলা রেমণ্ড গ্রেস আর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ডক্টর রবিন স্যানিয়েল। যেন এইমাত্র লটারীতে কয়েক লক্ষ টাকা জিতে এলেন এই রকম ভাবটা। যুগলে সদ্য বিবাহ রেজেস্ট্রী করে ফিরলেন। অফিস ঘরে কেক সন্দেশের বাক্সের বিরাট পাহাড়, ফলফুলেরও যেন রাজসূয় যজ্ঞ।

ডাক্তার তালুকদার ততক্ষণে নেমে এসেছেন। বলেন, হ্যাঁ, এই ভাল হ'ল। আমরাও এই চেয়েছিলাম। খুব ভাল খুব ভাল। মে গড ব্লেস ইউ বোথ। দুজনের কাঁধেই মৃদু চাপড় মারলেন।

একটা পেস্ট্রী ভেঙে খেতে খেতে বলেন, এসব খাবারটাবারের চেয়ে আমায় যদি একটু ইয়ে দিতে! বলে ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও মাঝের আঙুল দিয়ে একটু ইশারা করে বোঝালেন।

আজকের বধূমাতা হেসে গড়িয়ে পড়েন যেন। বলেন, ও স্যুয়োরলি মাই ডিয়ার বস্; মাস্ট বি। মাস্ট বি।

হেসে বলি, করলি কি? এক তো বুড়ো বয়সে বিয়ে করলি, তাও তো এক বুড়ীকে। এতে এত মাতামাতির আছেটা কি? কে জিতল, কে হারল পরে বুঝবি। যেমন দেবা তেমনি দেবী। যেমন শিব তেমনি শক্তি।

যুগপৎ চোখের সামনে জন্ম মৃত্যু বিবাহের লীলাখেলা দেখল যে, সেই আমি কিন্তু ভগবানও নই মাতালও নই সমাজবিরোধীও নই।

স্থান পাত্র কালের কথা বলি—

স্থান আমার বাড়ির দোতলার সরু বারান্দা। সেখানে ছেঁড়া হেলানো চেয়ারে আমি শয়ান। বাড়ির সামনে অতি সরু গলিপথ। ছাইয়ের গাদা, ডিমের খোলা তুলো ব্যাণ্ডেজ ও প্লাস্টারের কাটা আর জঞ্জালের স্তূপের ঠেলায় লোকজন বড় একটা যাতায়াত করে না। গলির পরেই কলকাতার বিখ্যাত এক নার্সিং হোম। যত বা নামের ঘটা তত বা গ্ল্যামারের ছটা। বিরাট ত্রিতল অট্টালিকার পিছনের দিকটা আমার বাড়ির দিকে। একতলায় অফিস ঘর, দোতলায় লেবর রুম, অপারেশন থিয়েটার, গোটা তিনতলাটা ছোট বড় নানা কেবিনে ভাগ করা।

পাত্র—আমি পরিচিতিহীন ছেঁড়া কোটের বুদ্ধিজীবী, পেশা ওকালতি যত্রতত্র। দুপুরে মক্কেলের কাজ করে দিয়েছি—ফী পাইনি; টাকার প্রত্যাশায় বসে আছি। মক্কেল বলেছে, বাড়িতে দিয়ে যাবে, আশা কমই। বাড়িওলা আজ তিনবার এসে ফিরে গিয়েছে। মক্কেল যেন আসে আর বাড়িওলা যেন আজ আর না আসে—মনে মনে এই কামনাই মঙ্গলময়ের কাছে করছি।

কাল—দিনের আলো নিবে এলো, সূর্য্যি ডোবে ডোবে হলেও আমার বারান্দায় তার অনেক আগেই আলো কালো হয়ে গিয়েছে। বিজলী বাতির বাল্‌ব কেটে গিয়েছে—বদলানো হয়নি।

॥ ১৯ ॥

লেন সরু, বাইলেন আরও সরু।

শনিবার ঠিক দুপুরে বাড়ি ফিরছি, আমাদের গলিতে ঢোকে কার সাধ্য। যেখানে যে সময়ে জনবিরল থাকবার কথা সেখানে সে সময়ে লোকে লোকারণ্য। লেনের মুখে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে। কিছুদূরে একটা কালো জাল দেওয়া গাড়িও। অতি কষ্টে জনসমুদ্রে ঠেলাঠেলি ক'রে লোকের বাড়ি রকের উপর দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে খানিকটা এগোতেই দেখি কিছুদূরে স্ট্রেচারে করে একটি নিশ্চল নিস্পন্দ এবং নিশ্চয়ই নিষ্প্রাণ নারীদেহ বয়ে আনা হচ্ছে। ভীষণ ভাবে তার সারা দেহ এমন পুড়ে গেছে যে চোখ মেলে দেখা যায় না। বীভৎসতার এরূপ ভয়াল দৃশ্য ইতিপূর্বে দেখিনি। অনতিদূরে লাল বাড়িটার সদর দরজায় দাঁড়িয়ে এক প্রৌঢ় এক আঁজলা রক্তগোলাপ ছুঁড়ে দিয়ে কেঁদে কেঁদে বলছে, গোলাপী, তুমি ছিলে কত আপন আগে জানিনি।

বুঝলাম লাল বাড়িটার বাসিন্দাই ঐ শোকার্ত প্রৌঢ় ভদ্রলোক এবং দগ্ধাঙ্গিনী তাঁরই অর্ধাঙ্গিনী। সার্থক নাম গোলাপী বটে—!

পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াটাও থমথমে। জনমহাসাগর অপেক্ষাকৃত প্রশান্তই ছিল বলব কারণ যে পরিমাণ হট্টগোল চেঁচামেচি হৈ-হল্লা হ'লে মানানসই হত সেরূপ কিছুই দেখিনি। জনতা ব্যথাতুর বলেই বুঝি বা নীরব। ভাবের যেখানে আতিশয্য, ভাষা সেখানে ফিকে হবে হয়তো।

পাশের লোক বললেন, কি পোড়ান্‌টাই না পুড়েছে মশায় দেখেছেন? আর ঐ হতভাগাটা এখন তো গলা ফাটিয়ে কেঁদে ভাসাচ্ছে। আসলে ইন্ধন যোগাবার রাজা একখানি। কেমন ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে দেখুন—তুমি আমার কত আপন আগে জানিনি। আরে ব্যাটা, সৈরভী তো গোলাপীর পায়ের যুগ্যিও নয়—আসমান-জমিন ফারাক্। চাঁদে আর বাঁদরে।

এবারে বুঝলাম বক্তা ভদ্রলোককে চেনেন। আমি কিন্তু চিনতে পারিনি যদিও এই গলিতেই আমি আছি প্রায় বছর খানেক।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, স্বামীটাকে জড়িয়ে যায়নি তো? আজকালকার মেয়েরা পারে না হেন কাজ নেই। জজিয়তি করে, এরোপ্লেন চালায়,

বোতল বোতল মদ গেলে।

এবারে বুঝলাম ইনি সৈরভীর কেউ হবেন বা প্রৌঢ়েরই কোন দরদী ব্যথী এবং গোলাপীর বিরোধী দলে।

তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, টানাটানি বকাবকি খ্যাচাখেচি মারামারি রাগারাগি চুলোচুলি গালাগালি গলাগলি না ঢলাঢলি কিছুই তো প্রাণ মালুম হ'ল না। বড় ধোঁয়াটে ঠেকছে।

চতুর্থ ব্যক্তি বললেন, ধোঁয়াধুঁয়ি বললেন না তো? তবে যতদূর বোঝা গেল ব্যাপারটা একটা নিছক সুইসাইড নয় বোধহয় কেন না যেরকম পুড়েছে—পুড়তেই বেশ খানিকটা সময় লেগেছে দেখছি। এখন কথা হচ্ছে পুড়িয়ে মারা, না মেরে পোড়ানো। তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল, ধপ্ করে পড়লো, না পড়ে ধপ্ করলো ভগবান জানেন। আগে রেপ্ পরে মার্ডার, না আগে মার্ডার পরে রেপ্।

পঞ্চম ব্যক্তি বললেন, ওটা আপনি স্রেফ্ বাজে কথা বললেন। কি জানেন, আত্মঘাতী হব মনে করলেই, জানি তো, আমার মধ্যে সেই আমিত্ব ভাবটা আপসে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে আসে। আসতেই হবে, আসতে বাধ্য। কেন, আমাদের ইতিহাস বলেনি এরকম পোড়ার কথা? ওটা হয় কিসের খে জানেন? আসলে যখন সেই পুড়ছে—সে ভাবে আর একজন পুড়ছে আর সে মজা দেখছে। আর সেই পোড়াটাকেও সে দস্তরমত কণ্ট্রোল করতে পারে। যেটা হয়েছে এই পার্টিকুলার কেসে। দেখুন আপনারা সবাই, পোড়াটা শুরু হয়েছে পা থেকে। উপর দিকে উঠতে উঠতে আগুনটাকে হার্টের কাছাকাছি চেক করা হয়েছে। ভদ্রমহিলার চুল একদম পোড়েনি। কতখানি আগুনে দখল দেখেছেন! সেই যে বলে না—আমি আথারপাথার কাটবো সাঁতার, চুল ভেজাবো না।

ষষ্ঠ ব্যক্তি বললেন, মজালে রাক্ষসকুলে মজিলা আপনি। খানিকটা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে পুনরায় বললেন, দেবী যান সর্গে তার আগে মর্গে। পোস্ট-মর্টম তো হবেই।

সপ্তম বক্তা সর্বশ্রী দুজনকুমার—যাদের আপনারা পথেঘাটে অনেকবার দেখেছেন। যারা উদ্দাম, যারা চঞ্চল, যারা কারোর কথা মানে না। এ হেন দুজনকুমার উভয়েই উল্লসিত আবেগময় ও গীতমুখর। একজন অনুচ্চস্বরে কি একটা গানের কলি গাইলে। শুনতে পেলাম, বুঝতে পারলাম না। অপরজন প্রথমে বলে উঠল, নেহি, নেহি, নেহি। আবার পরক্ষণেই টেনে টেনে বললে,

হোগা, হোগা, হোগা। বলেই বন্ধুবরের গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

আমার অন্তরে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রকাশ্যে ভ্রূকুটি করতে যাব, শুনলাম, সুরটার চটক আছে মাইরী, সাধে আজ বাংলার কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরছে—বল্? বোল্ রাধা বোল্।

আমি ব্লাডপ্রেসারের রুগী। বললাম, এই পরিস্থিতিতে গান আসে কোত্থেকে? গানে অরুচি।

সঙ্গে সঙ্গে মুখের উপর জবাব পেলাম, আপনার তো দেখছি জ্ঞানে অরুচি স্যার।

রাগত স্বরে বললাম, মানে?

জবাব হ'ল, যা দেখছেন সবটাই জাল, ষোল আনা মেকী, একশো পারসেণ্ট ঝুটা।

অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে আবার বললাম, তার মানে?

সহাস্যে জবাব হল, তার মানে ও লোকটা এর স্বামীই নয়, ও হল ভোলা বিশ্বেস্। এবারে প্রথম চান্স পেয়েছে। গোলাপী গোলাপী ক'রে কেঁদে ফাটাচ্ছিল যার দিকে চেয়ে ঐ মেয়েটা হল ফ্লিম-স্টার। মিস সোনালিকার নাম শুনেছেন? টক্ অফ দি ডে। এটাই বোধহয় মেয়েটার মাস্টার হিট্ হবে। উনি মোটেই পোড়েন-নি, সবটাই মেক্আপ। বইয়ের সুটিং হল, বুঝলেন না?

দ্বিতীয় জন বললে, আরে মশায়, এই মড়ার রোলটা করার জন্যেই খোঁজ নিয়ে দেখুন, কমসে কম পঞ্চাশটি হাজার ঝেলেছে, আই. টি. ওর ক্ষমতা কি যে ধরে? তাও দু নম্বরে—মানে ব্ল্যাকে।

নেবে না? এত লোকের সামনে পাবলিক প্লেসে আলুথালু হয়ে এতক্ষণ শুয়ে থাকবে, এতগুলো হ্যাংলা চোখের সামনে ন্যাকামো নাকি? নেবে না? আর এই যে শুনলেন এত লোকে এত কথা বলে গেল কেউ কি নিজের কোন কথা বলেছে ভাবছেন? সব শালা তোতাপাখীর মতন শেখানো বুলি কপচে গেল জানবেন। ঐ একতলার ছাদে শোলাহ্যাট মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কারা দেখুন।

নিমেষে রাগ নিভে গেল। ভাবতে লাগলাম না জানি আমাদের প্রত্যেকের প্রতিদিনের কার্যকলাপ, চলনবলন অঙ্গিমা-ভঙ্গিমা, হাসিকান্না কার ডিরেকশনে চলছে। কোন্ ক্যামেরাম্যানই বা সকলের অলক্ষ্যে তার ছবি তুলে রাখছেন পরে ভবিষ্যতে হয়তো অকাট্য প্রমাণ হিসাবে আমাদের ছবি আমাদেরই দেখানো হবে পরপারে পুরস্কার-তিরস্কারের হিসাব-নিকাশ করবার সময়ে।

॥ ২০ ॥

বড় সাহেবের স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে।

সভারোহণে সোদপুরে যেতে হয়েছিল, ব্যবস্থাপনার বিপুলতা মালুম হল তখনই যখন অকুস্থলের অনতিদূরে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে বাস থেকে নামলে কানে গেল ঘোষকের ঘোষণাঃ পাঁচপন্ লাম্বার গাড়ি, রবার্টসান সাহেব চলা আইয়ে—বাষট্ লাম্বার খান্ বাহাদুর গোলাম আলি—বাষট্ লাম্বার—

অন্তত বাষট্টিখানা গাড়ি যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখানে একশত বাষট্টি টাকার আমার মতন কেরানী যে ভড়কাবে তাতে আর বিচিত্র কি।

হাজিরা একবার দিতেই হবে নতুবা হয়তো চাকরি থাকবে না। সাহস করে ভিতরে গিয়ে দেখি সে এক রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন। যেমন বিরাট প্যাণ্ডেল তেমনই নয়নাভিরামভাবে সুসজ্জিত। পারিপার্শ্বিক উপযুক্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহাওয়াও বড় মানানসই হয়েছিল। সেদিনের ফোটা গোটা পৃথিবীর বোধহয় সমস্ত সাদা ফুল ছিঁড়ে সভা সাজানো হয়।

দূরে—বহুদূরে মনোমুগ্ধকর বেদীর উপর সুধাকণ্ঠ কীর্তনাচার্যের অপূর্ব কীর্তন-লহরী। কর্কশ গগনভেদী নিনাদে আতঙ্কিত না হয়ে সভার শেষ লোকটিও যাতে পরিষ্কারভাবে শুনতে পায় মাইক এমনই নরম ছিল।

স্তাবকজনমণ্ডলীতে ঘেরাও বড় সাহেব প্রখ্যাত ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ওয়াই কে ভোস্ সাহেব যাঁকে গতবছর সরকার পদ্মবিভূষণ খেতাব দিয়েছেন তিনি আরাম-কেদারার ডানলোপিলোতে ঝিমোচ্ছিলেন। পাশে বিদেশিনী পি. এ.—ডান হাতে তাঁর মেজর গ্লাসে একটু লাল ওষুধ আর বাঁ হাতে ধরা ছিল মোটা-সোটা একটি সিগার। খানিকটা অন্তর অন্তর সাহেবের মুখে গুঁজে দিলে সাহেব একটু টেনে ছেড়ে দিচ্ছেন। শোকব্যথিত মুদ্রিত নয়ন মধ্যে মধ্যে খুললে একাধিক নিমন্ত্রিতের মাথা যখন সামনে ঝুঁকে পড়ছে—সাহেব কখনও বাঁ হাতটি একটু তুলছেন কখনও বা মাথাটি অল্প নাড়ছেন আবার কদাচিৎ অতি ঈষৎ হাসির রেখায় যেন সকলকে আপ্যায়িত করছেন। পরমুহূর্তেই আবার দেহভার এলিয়ে পড়ছে। নয়নযুগল মুদ্রিত করছেন যেন শোকসাগরে ব্যথাতুর চিত্তে হা সীতা, হা সীতা করে পরক্ষণেই তিনি পুরু ডানলোপিলোতে ডুবে যাচ্ছেন।

প্রশান্ত নির্লিপ্ততা মাখানো মুখে ছোট সাহেব ঘোরাফেরা করছেন—মায়ের শ্রাদ্ধে বসতে তখনও বিলম্ব ছিল। দুগ্ধফেননিভ শুভ্র ধুতি-চাদরে ঢাকা তাঁর গৌরকান্তি মুণ্ডিত মস্তক দেখে ছবিতে দেখা নিমাইয়ের কথাই আগে মনে পড়ে। মাতৃদায় থেকে উদ্ধার করতে নিমন্ত্রিতের দল নিজ নিজ কর্তব্যবোধেই তো আসবেন। তাঁদের আসুন বসুন বলার কি থাকতে পারে তা তাঁর বোধগম্য হয় না। এক একটি নিমন্ত্রণপত্রের ছাপাই খরচাই যেখানে সাত টাকা পড়েছে—সেখানে কি অভ্যর্থনার আন্তরিকতা কিছু কম?

সভায় লোকারণ্য। তিল ধারণের স্থান বোধ হয় আর নেই। একে ছুটির দিন, তায় বড সাহেবের স্ত্রী, তায় আবার শ্রাদ্ধবাসর। এই ত্র্যহস্পর্শে না গিয়ে উপায় ছিল না। যাত্রা নাস্তি তো নয়ই বরঞ্চ যাত্রা প্রশস্ত বলা যায়।

আমি গিয়ে একপাশে শেষের দিকে বসলাম। সম্মুখে বিশেষ জায়গা ছিল নাও বটে আবার হাজিরা দিয়ে ও প্যালা না দিয়ে সরে পড়বার মতলবেও বটে। দূর থেকে ভেসে আসা মিষ্টি গানের রেশ মন্দ লাগছিল না। চোখ বুজে কীর্তন শুনছিলাম।

মরিলে টাঙায়ে রেখো তমালেরই ডালে—

বেলফুলের মালাটা হাতে জড়িয়ে মধ্যে মধ্যে আঘ্রাণ নিচ্ছিলাম। হয়তো মাথাটাও অল্পসল্প দুলছিল, জানি না। সহসা শুনলাম আমার কিছুটা পিছনদিক থেকে আর একটি করুণ কোমল গানের কলিও ভেসে এল। সমান মৃদুভাবে এবং সমান মাদকতায় অপূর্ব সুরের মূর্ছনায়।

পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি বাবু ভিকনচাঁদ তাপুরিয়ার হাতে ধরা বিরাট একটা পানের বাক্স আর ছোট্ট একটি ট্রানসিস্টার। সদাসর্বদা খোলাই থাকে, বন্ধ বড় একটা করেন না।

দুটি গানের সুরেই বিয়োগ-বেদনার ব্যাকুলতা ও বিহ্বলতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল বটে কিন্তু ভঙ্গিমা ভিন্নমুখী।

আরে বাবু, আপনি পিছন দিকে বৈঠা হ্যায়, তা কোভি হোতা? সাহেব দেখলে আমাদের উপর কত গোসা করবেন। আপনি আমার জায়গায় বসুন, না হয় তো একটু এগিয়ে চলুন, আপনাকে বসিয়ে দিই। এত তকলিফ ক'রে এলেন আর সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন না?

নিজের জায়গা ছেড়ে উঠতে পাবার সুযোগের সদ্ব্যয় করে ঐ স্থান থেকে প্রস্থান করলাম।

সেইদিনে আবার আমার বাল্যবন্ধু নরেনের মায়ের শ্রাদ্ধের দিনও ছিল। একই দিনে। আমাকে পোস্টকার্ডে চিঠি দিয়েছিল। আসতে পারেনি। নরেনরা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত, অধুনা বাঁশধানিতে উঠে গেছে। শ্রাদ্ধের দিনে একবার গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় একটা-দেড়টার কাছাকাছি। কোথায় সোদপুর আর কোথায় বাঁশধানি। তখন শ্রাদ্ধ প্রায় সমাপ্তির দিকে। আয়োজন যৎসামান্য, লোকজন একেবারেই নেই।

নরেনের বাবা ঘরের সামনে মোড়ায় বসেছিলেন। ইশারায় আমাকে পাশে বসালেন। পিঠে সস্নেহে হাত বুলোলেন।

পিণ্ডদানের পূর্বে পুরুতমশাই বললেন, প্রিয় বস্তুটি দিয়েছ তো? তোমার মা যা খেতে ভালবাসতেন দিয়েছ? তাঁর তৃপ্ত্যর্থে তাঁর প্রিয় জিনিসটি দিতে হয় যে বাবা।

নরেনের বাবার সম্বিৎ ফিরল। বিব্রত হয়ে পড়লেন। ছেলে শ্রাদ্ধে বসেছে। কাকেই বা ডাকেন। দ্বিতীয় কোন লোক আর সেখানে নেই। আমায় ডেকে বললেন, এই মোড়ের দোকান থেকে অল্প টক্ দই এনে দাও তো একটু, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। সব কিছু আজকাল ঠিক মনে করতে পারি না। কার কাজ তদ্বির করা আর কে আজ তদ্বির করছে দেখো। টক দই ওর মা বড্ড ভালবাসত। একটু-খানি টক দই পেলে আর কিছুর দরকারই হত না। মাছটাছ তো ইদানীং কিনতেই পারতাম না। গরীবের সংসার, বুঝতেই তো পার।

মোড়ের দোকান থেকে অল্প কিছু টক দই এনে দিলাম।

পুরুতমশায় নরেনের হাতে মাখা পিণ্ডের খানিকটা দিয়ে বললেন, মাকে অন্তরে ওটা স্মরণ কর, মনে মনে ডাকো, মার হাতে দাও। শ্রদ্ধা ক'রে ভক্তিভরে মাকে ডেকে দাও। আমরা কথায় বলি শ্রদ্ধয়া দত্তম্ ইতি শ্রাদ্ধম্।

আমার দৃষ্টিভ্রম হল কিনা জানি না, আমি যেন দেখলাম বেলা মাসী সেই শাঁখা-পরা ফর্সা রোগা হাত দুটি বাড়িয়ে তিনি ছেলের দেওয়া দান গ্রহণ করলেন।

দৃষ্টি ফেরাতেই নরেনের বাবার মুখে করুণ হাসি দেখলাম।

হাসির কি থাকতে পারে?

তবে কি আমিও যা দেখেছি, তিনিও তাই দেখলেন?

ভাল কাজে কত বাধা।

ভিতরে বাধা বাইরে বাধা। তাই সুনন্দা বলছিল।

বলছিল কয়েকজনে মিলে একটি ক্লাব খোলবার সাধু সংকল্প করেছি। সভাপতি সহ-সভাপতি সম্পাদক অবর সম্পাদক যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ হিসাব রক্ষক হিসাব পরীক্ষক কার্যকরী সমিতি পৃষ্ঠপোষকমণ্ডলী প্রধান অতিথিগোষ্ঠী মনোনয়ন পর্যন্ত ভালয় ভালয় কাটবার পরে ক্লাবের কি নাম দেওয়া যায় তারই জল্পনা কল্পনা আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদেরই মধ্যে সুনীল হাসতে হাসতে বলে, কাকলী নামটা দিলে বেশ মর্ডান গোছের হয়। কা-ক-লী তাই না?

সুচিরা মাথা নাড়তে নাড়তে জবাব দেয়—উহুঁ, শুধু কাকলী বললে যেন বড্ড ন্যাড়া ন্যাড়া শোনায়। কোকিল কাকলী বললে তবেই বিউটি।

সুধীন কাশতে কাশতে রায় দেয়, আরে না না, হল না, কোকিল কাকলীও ঠিক হল না। আমরা বলব আকুল কোকিল কাকলী—স্প্লেনডিড কিনা সত্যি করে বলতে হবে সকলকে। কি? ঠিক বলেছি কি না?

সুচিতা শিস দিচ্ছিল, বলে, একটা ইয়ে মানে নামের আগে খানিকটা ইয়ে মানে বাতাস ইয়ে করে মানে হু হু করে ইয়ে করে দিয়ে মানে বইয়ে দিয়ে আরও খানিকটা ইয়ে মানে পোয়েটিক করতে পারলে তবেই না ইয়ে—।

সুধীর সশব্দে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে প্রকাশ করে, রাইট্ ইউ আর—তবে যা-তা বাতাস হলে তো আর হবে না—খানিকটা মলয় বাতাসের দরকার হবে। কি ফার্স্ট ক্লাস শোনাবে মলয় বাতাসের আকুল কোকিল কাকলী। যেন উপমা অর্থগৌরব পদলালিত্য তিনটে একসঙ্গে পাঞ্চ করা। আঃ—বলে চোখ বুজল। মলয় বাতাসের আকুল কোকিল কাকলী—।

সুস্মিতা মিঠে পান মুখে দিচ্ছিল, হাত সরিয়ে টিপ্পনী কাটে, র, অনাবশ্যক বাই দি রুল ষষ্ঠী চানাদরে—অর্থাৎ কিনা 'র'-এর অনাদর যেখানে, সেখানে ষষ্ঠী না হয়ে সপ্তমী বিভক্তি হবে। শুধু কেবল "মলয় বাতাসে আকুল কোকিল কাকলী—"

সুবীর সিগারেট টানতে টানতে বলে, হ্যাঁ হল বটে, ভালই হল, তবে কিনা

একটু খালি ছোট্ট ডিফেকট্ থেকে গেল—বাতাসটা মলয় হচ্ছে ভালই, হোক, তবে হু হু করে সেটাকে বহালে তো চলবে না। সেটাকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বইয়ে বইয়ে বলতে হবে—মৃদুমন্দ মলয় বাতাসে আকুল কোকিল কাকলী—ব্যস ইউনিক. যাকে বলে নবতম অবদান। আজকের এই ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণীতে এক নবতম অবদান। বাইরে যথার্থই মেঘলা ছিল সেদিন।

ইতিমধ্যে আমাদের সম্পাদকের আবির্ভাব হল। তিনি তখনও হাঁপাচ্ছিলেন, পরে বললেন লাস্ট টারগেটটাও ফস্‌কে গেল। কোথাও ঘর খালি না পেয়ে যদু গাঙ্গুলী লেনের ঘরটা যদিও বা পছন্দ গোছের হ'ল তো বাড়িওয়ালা আজ সাফ্ বলে দিলেন—ক্লাবক্লাব ভাড়া দেবো না মশায়—চারিদিকে ভদ্রলোকের বাস। রাত দিন নাচ গান হৈ হল্লা ইয়ারকী ফুক্কুড়ী ইতরামি গলাবাজী চলবে না—না হয় তো সেই আজ—"সত্য সেলুকাস"—কাল "বল মাতা আমার পিতা কে?" যত সব পাঁচ ভুতের কাণ্ড, ভাড়া দেবে কে? সব তো এক একটি ভারতরত্নম্।

সম্পাদক মশায় আরও বললেন, তার চেয়ে বরঞ্চ হাজার পাঁচেক টাকার যোগাড় করতে পারলে চুনী স্যাকরাটাকে একবার বলে দেখি। তার মোড়ের মাথার ঘরটা ছেড়ে দেবে বলেছে। তবে ক্লাবের নামটা কিন্তু হবে ক্ষ্যান্তময়ী জুয়েল হাউস্। নামটা পাল্টালে চলবে না। বাড়িওলাই বা অন্য নামে বিল কাটবে কেন? তা হলেই তো সে এমন কোপ মারবে যে সামনের পা দুটো পর্যন্ত মুড়ির সঙ্গে চলে যাবে। পাঁঠাবলি দেখেছো কোনদিন?

পাঁচ হাজার টাকা?

ঘাবড়াবার কি আছে তাতে? বলে সুপ্রিয়, অর্থাৎ যুগ্ম কোষাধ্যক্ষের একজন অপরজনকে। হাজার তিনেক তো ইতিমধ্যেই—বাকীটা পদ্মভূষণকে বললেই তো কেস জিত।

সুচিত্রা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, হুঁ, কোথায় বা পদ্মভূষণ আর কোথাই বা হাজার তিনেক—সবটাই তো কাগজে কলমে আর সবটাই তো আশায় ও স্বপ্নে।

কেন? পদ্মভূষণ কি বললেন? সুপ্রিয় জিজ্ঞাসা করে।

উত্তরে সুচিত্রা বলে, কিছু আশা না দিয়ে নিরাশ ক'রে ভাগিয়ে দিলেন—আবার কি?

তুমি কি বলেছিলে?

তুমি যা যা বলতে বলেছিলে।

তবু ?

গিয়ে নমস্কার করে হাসিমুখে মিহিস্বুরে বললুম আমরা একটা ক্লাব করছি। একটা ওয়েস্ট বেঙ্গল কালচার্ড্ অ্যাণ্ড অ্যারিস্ট্রোক্রাটিক রঁাদেভু। সভাপতি হিসাবে—দি অনারেবল মিস্টার জাস্টিস চট্টরাজ আছেন, পণ্ডিত শংকরনাথ আছেন, স্যার জনস্টোন গিলবার্ট আছেন, বড়ে জমায়েৎ আলি খাঁ আছেন, কুমার রুদ্র ইন্দ্রনারায়ণ অফ কদমতলা আমাদের পেট্রোন, আপনাকেও আমাদের মধ্যে পেতে চাই স্যার। আপনি তো এ অঞ্চলের সিয়ন, কৃষ্টির কাণ্ডারী—আমাদের বেদান্ততীর্থ মহাশয় বলেন আপনি হলেন সেই 'ঘনান্ধকারে শিবদীপ দর্শনম্‌-এর মতন আশার প্রদীপ।

বাঃ, বেড়ে গুছিয়ে বলেছো তো ? টাকার কথা কিছু উঠলো না ?

উঠলো না আবার ? জিজ্ঞেস করলেন,—মূল্য কি দিতে হবে ? কতখানি খস্‌বে ?

আমি বললুম, পেট্রন হ'লে এই, লাইফ মেম্বার হলে এই।

তারপর ?

তারপর ভদ্রলোক নিজের ডায়েরী খুলে বললেন, দেখুন, সর্বসাকুল্যে আমি পনেরোটি ক্লাব সভা সংঘ আসর বাসর জলসা সমিতি বৈঠক মন্দির মিতালী মজলিস সম্মেলন ইউনিয়ন এসোসিয়েশন ইনস্টিটিউসনের সঙ্গে জড়িত আছি। ফলে শ'দেড়েক টাকা প্রতি মাসে গলে যায়। তার বদলে তো পাই মাসে দুটো-একটা ফুলের মালা বা দু-একটা ফুলের তোড়া। পরের দিনে তা জঞ্জালে পরিণত হয়। আর বেশী সভ্য না হয়ে অসভ্য ভাবেই বলছি আমাকে মেম্বার হওয়ার জন্য আর বিরক্ত করতে আসবেন না বা অন্য কাকেও কখনো পাঠাবেন না। আর বেশী সভ্য হওয়া আমার পোষাবে না—একেবারে ডেফিনিট্। অসভ্য বর্বর যুগে ফিরে যেতে পারলে মন্দ হয় না।

॥ ২২ ॥

কুণালকুমার নায়ক আর বকুলমালা নায়িকা

নায়ক বলে—জানো তোমার বাবা তোমাকে বকুলমালা বলেন আর আমার বাবার কাছে তুমি বকুল মা। তাই না?

নায়িকা বলে—জানি, আমার মা আমাকে বকুল বলেন আর তোমার মা আমাকে বকু বলেন। তাই তো?

নায়ক বলে—চাঁদের কলার মতন খসতে খসতে তোমার নামটা শুধু প্রথম অক্ষরে যে দাঁড় করাবে, কে বল তো? কে সে ভাগ্যবান? বৌকে আবার অনেকে বো বলে জানো তো?

নায়িকা বলে—হোয়াট ডু ইউ মিন্? সাহস তো খুব?

নায়ক বলে—না, এম্নি, ও কিছু না—কথা খেলা খেলা করছিলুম—মানে আর কি কথা কথা খেলছিলুম।

ব্যাকগ্রাউণ্ডটা তবে একটু খুলেই বলি। রাস্তার একদিকের বাড়িতে থাকেন পদ্মশ্রী ক্ষিতিপতি নাথ, রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট এণ্ড সেসনস্ জজ আর এঁর স্ত্রী ও একটি মাত্র কন্যা অতি আধুনিকা মিস বকুলমালা।

রাস্তার ওদিকের বাড়িতে থাকেন ডাক্তার রাজীবরঞ্জন এম্. ডি. এফ. আর সি. এস. এম্. আর. সি. পি. আর তাঁর স্ত্রী ও একটি মাত্র পুত্র ডক্টর কুণালকুমার।

মাঝখানে সরু গলি বয়ে চলে যায়।

কথাবার্তা মেলামেশা আসাযাওয়া হাসিঠাট্টা গল্পগুজব খুবই ছিল দুই পরিবারে। পাড়ায় নাকি আর কোন পরিবারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মেলে না।

কর্তারা পরস্পরে ব্রাদার, গিন্নীরা পরস্পরে দিদি। নায়ক নায়িকা "আসুন বসুনের" পর্ব চুকিয়ে "এসো চলোর" ফষ্টিনষ্টির পর্যায়ে নেমেছে বটে তবে আশানুরূপ প্রোগ্রেস হচ্ছে না। অগ্রগতিতে অগ্রণী হতে কেউই আগ্রহ দেখাতে চায় না। ভাবটা যেন—বঁড়শীতে তো গাঁথাই আছে, যাবে কোথায়—একটু খেলিয়ে তুলি।

নায়িকা ভাবে—দেখতে ভালো, বয়স কম, পাস করেছি, নাচতে জানি, গাইতে পারি, রোয়িং জানি, ড্রয়িং পারি, কবিতা লিখি, সিনেমা দেখি, গীটার

বাজাই, টেনিস খেলি, স্যুটিং শিখি, বংশ ভাল, পয়সা আছে। কিসে খাটো আমি—লেট্ হিম সারেনডার। অমন ছেলে গাদা গাদা।

নায়ক ভাবে—কি দুঃখে? রূপবান, গুণবান, স্বাস্থ্যবান, অবস্থাপন্ন, সচ্চরিত্র, উপার্জনক্ষম, বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, ফোন আছে, ফ্রীজ আছে, এক ছেলে, বিলেত যাবে। প্রপোস্ করুক, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট করছি। লেট হার সাজেস্ট ফার্স্ট। অমন মেয়ে গণ্ডা গণ্ডা।

পদ্মশ্রী ভাবেন—রিটায়ার্ড হলেই বা একদা ডিস্ট্রিক্ট এণ্ড সেসনস্ জজ তো বটে। বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইয়েছি—আমি নোয়াব মাথা? অসম্ভব! পাঁচটা নয় সাতটা নয় আমার দি ওন্লি চাইল্ড।

ডাক্তার ভাবেন—আমার নামের আগে পেছনে কটা ছাপ, কটা শূন্যতে ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স হাকিম কি খোঁজ রাখে না? হাকিমী করতো কি করে?

নায়িকার মাতা ভাবেন—দিদিই তো আগে কথাটা পাড়তে পারেন। বকু বলতে তো অজ্ঞান, গান শুনতে তো পাগল আর খোলাখুলি কথাটা বললেই প্রেস্টিজ ঢিলে?

নায়কের মাতা ভাবেন—দিদির রকমসকম যেন কেমন কেমন। ছেলে বিলেত যাবে বললুম, কই বললে না তো বিলেত যায় তো দুটোতেই যাক্—না হয় তো কেউই না। আমার তো তাই ইচ্ছে।

কালের চাকা পুরো একটা পাক ঘুরে গেল মানে পৃথিবীটা সূর্যকে ফুল একটা রাউণ্ড দিয়ে এল। নায়িকা একুশ পেরিয়ে বাইশে পড়ল, নায়ক আটাশ পেরিয়ে উনতিরিশে পা বাড়াল।

নায়িকা এখন ভাবে—হ'লেই কিন্তু ভাল হয়। মিয়ার ওয়েস্ট অফ সিয়ার টাইম।

নায়ক এখন ভাবে—এ তরফ থেকে গ্যারান্টি দিচ্ছি।

পদ্মশ্রী এখন ভাবেন—ঘর বর ভালো বলেই না। পথে বাজারে ট্রামে বাসে গঙ্গার ঘাটে গড়ের মাঠে যেখানে হোক একটু হিন্ট দিক ডাক্তার, রেস্ট্ আই উইল ডু।

ডাক্তার এখন ভাবেন—আমার উপরও হাকিমগিরি? লেটাস্ বি ওপোন অ্যাণ্ড ফ্রাঙ্ক।

নায়িকার মাতা এখন ভাবেন—দিদির এরূপ ভাবে জিনিসটা টাঙিয়ে রাখা খুবই খারাপ।

নায়কের মাতা এখন ভাবেন—এতদিন কোনকালে আমিও ছেলে বৌ নিয়ে ঘর করতুম আর তুমিও তো মেয়ে জামাই নিয়ে সাধ আহ্লাদ করতে পারতে।

দু বাড়ির মধ্যে কথাবার্তা মেলামেশা হাসিঠাট্টা গল্পগুজব আসা-যাওয়া পূর্ব-বৎই চলতে থাকে।

মাঝখানে সরু গলি বয়ে চলে যায়।

নায়ক এখনও নিয়মিত ভাবেই প্যাটিস কাটলেট বয়ে আনে আর নায়িকা নিয়মিত ভাবেই খায়।

নায়িকা চোখ বুজে যখন চর্বণ করে নায়ক চোখ চেয়ে রূপসুধা পান করে, নায়িকা এখনও নিয়মিত ভাবেই রুমালে নাম তুলে দেয়। নায়ক তাই চায়। ঘন ঘন জামার বোতাম ছেঁড়াটাও যেন বেড়েছে ইদানীং।

পদ্মশ্রী এখনও নিয়মিত ভাবেই ডাক্তার বাড়িতে সন্ধ্যায় দাবা খেলতে যান। মেডিসিনাল ডোজে একটু আধটু পানীয়ও যে চলে না তা নয়। ওটা নাকি শরীরটাকে টোন্ আপ্ করে দেয়

ডাক্তার এখনও নিয়মিত ভাবেই প্রতিদিন ভোরে গঙ্গাস্নানে যাওয়ার সময়ে পদ্মশ্রীকে ডেকে গাড়িতে তুলে নেন—স্রোতের জলে অবগাহন নাকি অনেক রোগের প্রতিষেধক।

নায়িকার মাতা এখনও নিয়মিত ভাবেই ডিমের কাশ্মিরী জেলী আর ইটালীয়ান টোম্যাটো স্টু বুঝিয়ে দেন। রান্নায় নাকি তিনি আধুনিকা দ্রৌপদী।

নায়কের মাতা এখনও নিয়মিত ভাবেই বকু রেডিয়োতে গান দিতে যাওয়ার দিন আধ ঘণ্টা আগে গাড়ি পাঠিয়ে দেন। আহা, মেয়েটা যে শুধুই সঙ্গীতানু-রাগিণী তা নয়—সঙ্গীতজ্ঞাও বটে।

বিবাহকোরক যেন ফুটে ফুটেও ফুটছে না।

মাঝখানে সরু গলি বয়ে চলে যায়।

এক রবিবারের কাগজে বিজ্ঞাপনস্তম্ভে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতারা পড়লেন লেখা বেরিয়েছে—পাত্রী চাই, ডাক্তার পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী তন্বী সুশ্রী দীর্ঘাঙ্গী সঙ্গীতজ্ঞা অন্তত গ্রাজুয়েট পাত্রী চাই। পাত্র একমাত্র সন্তান—কলকাতায় বাড়ি আছে ও অবস্থাপন্ন—দাবীদাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সত্বর লিখুন, পোস্ট বক্স, কলিকাতা। ঠিক নীচেই আর একটি বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে, পুত্রের বিবাহেচ্ছুক পিতামাতারা দেখলেন লেখা আছে—পাত্র চাই। নিখুঁত সুন্দরী—উত্তরাধিকারিণী—উচ্চশিক্ষিতা ও সর্বগুণসমন্বিতা পাত্রীর জন্য

উপার্জনক্ষম চরিত্রবান বিদ্বান ও প্রিয়দর্শন পাত্রের আবশ্যক। ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার কি এ ক্লাস অফিসার পাত্র বাঞ্ছনীয়। কলকাতায় বা উপকণ্ঠে নিজ বাটি থাকা চাই। পাত্রী এম. এ. পড়ছে—দাবীদাওয়ায় আটকাবে না। সত্বর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। পত্র ব্যবহার করুন—পোস্ট বক্স কলিকাতা।

ডাক্তার নিজের দেওয়া প্রথম বিজ্ঞাপনটা একবার চোখ বুলিয়েই নীচেরটাতে নজর পড়াতে সেটা বহুবার পড়লেন ও গৃহিণীকে শোনালেন। গৃহিণীর হুকুম হ'ল, এক্ষুনি লিখে দাও, দেরী কোরো না, এ সম্বন্ধ দেখো পড়ে থাকবে না। টেলিফোন কর না? নম্বর দেয়নি?

ওদিকে পদ্মশ্রী নিজের বিজ্ঞাপনটি বেরিয়েছে কিনা দেখতে উপরের বিজ্ঞাপনটি দশবার পড়লেন। নিজে পড়ে গৃহিণীকে পড়তে দিলেন। গৃহিণীর রায় হল আজই খোঁজখবর নাও। এ রকম সম্বন্ধ বড় একটা নজরে পড়ে না। সম্বন্ধ হিসেবে একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

বলাও যা করাও তা মানে গিন্নীরা বলা মাত্রই কর্তারা জবাব লেখা কাজটি সম্পাদন করলেন। করাও যা হওয়াও তা অর্থাৎ কর্তারা জবাব লেখা কাজটি করামাত্র সঙ্গে সঙ্গে চিঠিবৃষ্টি হতে লাগল।

ডাক্তার দেখলেন কোন একটি পত্রের অধোভাগে লেখা আছে ইতি পদ্মশ্রী ক্ষিতিপতি নাথ রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট এণ্ড সেসনস্ জজ। একবার দুবার তিনবার চিঠিখানা পড়ে ডাক্তার মনে মনে হাসলেন।

ওদিকে পদ্মশ্রী দেখলেন কোন একখানি চিঠির পুরোভাগে লেখা আছে ডাঃ রাজীবরঞ্জনের নাম ও তার লেজুড় পড়ে হেসে গৃহিণীকে পড়তে দিলেন।

কেউই কারোর কাছে কিছু প্রকাশ করলেন না। দিনসাতেক পরে এক সন্ধ্যায় দাবার আসরে ডাক্তার বললেন, সেই তো মাথা নোয়ালে ব্রাদার তবে এত ভোগালে কেন? এই দেখ তোমার চিঠি।

তুমিও তো জেদ ভাঙলে ভায়া, শুধু শুধু এত জ্বালালে কেন? তোমার চিঠিও আমার পকেটে—এটা চিনতে পারো?

ডাক্তার হা হা করে হাসলেন।

হাকিম হু হু হু হাসিতে প্রত্যুত্তর দিলেন।

দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বেজে গেল।

ডাক্তার বললেন, মিউচুয়েল সারেনডার—

পদ্মশ্রী বললেন, সাইমালটেনিয়াসও বটে।

দোতলার দৃশ্যে দেখা গেল নায়িকার মা নায়কের মাকে ডেকে বলেন—দিদি, চাইনীজ চপটা করে দেখেছিলে?

নায়কের মায়ের জবাব হল—কোন্ দুঃখে? তুমি মেয়ে-জামাইয়ের জন্য করলে বেয়াই বেয়ানকে কোন্ না দু-চারটে পাঠাবে গো?

তেতালার দৃশ্যে দেখা গেল নায়কের মাথার চুলে বিলি কাটতে কটাতে নায়িকা বলে—এবারে সত্যি করে বল দেখি বিলেতে যাচ্ছ কি না?

নায়ক বলে—যদি যাই?

নায়িকা বলে—উহুঁ, আইদার বোথ অর নান্।

নায়ক বলে—আর কি কণ্ডিশন?

নায়িকা বলে—গাড়িতে তেল আছে?

নায়ক বলে—কোথায় যাবে? বিলেতে?

নায়িকা হেসে বলে—আজকে কাছাকাছি কোথাও—

নায়ক বলে—হঠাৎ হাসির ভলক্যানিক ঝলকানি কেন?

নায়িকা বলে—কেন জান? এতাবৎকাল চাকরির ক্ষেত্রেই কেবল দেখা গেছে কোন বিশিষ্ট পদে কোন মনোনীত ব্যক্তি বহাল হবার পরেই অমুক পদে অমুক বেতনে অভিজ্ঞ সুদক্ষ কাজ জানা লোক চাই বলে বিজ্ঞাপন বেরোয়—কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে উই আর ফার্স্ট।

নায়ক বলে—আমি কিন্তু জানতুম।

নায়িকা বলে—আর আমি বুঝি জানতুম না।

॥ ২৩ ॥

তরেন বাবু, নরেন বাবু, বরেন বাবু আর হরেন বাবু।

তরেন বাবু বলেন, কি জান, মরণটা বড় একটা ঝপ ক'রে কখনও এসে পড়ে না। একটা ওয়ার্নিং দিয়ে হুঁশিয়ার প্রায় করেই দেয় দেখি। আমার যেমন এই সেবারে হয়েছিল—কোন কাজেই গা বইত না, চাড় হত না, স্পৃহা থাকত না, মন বসত না, ভাল লাগত না। মানে কি?—মানে আর কিছুই নয়, একটা ওয়ার্নিং—বলে কাজ তো সবই সারা হ'ল আর কেন? অনেক করে সামলেছি। বলে নাসারন্ধ্রে বিরাট একতাল নস্যি গুঁজে দিলেন। হাঁচলেন না।

নরেনবাবু জের টেনে বলেন, ঠিক বটে, আসার আগে জানান দিয়ে আসে কেমন জান? একটা যেন উড়ু উড়ু ফাঁকা ফাঁকা ভুলো ভুলো ভাব। খেয়েই জিজ্ঞেস করতাম খেয়েছি তো? ঘুমিয়ে উঠেই বলতুম ঘুম আজকাল মোটে হচ্ছে না। কাগজ পড়েই বলতুম আজকের পেপারটা চোখেই দেখলুম না, বহু চেষ্টায় সেটাকে কাটিয়ে উঠেছি—বলে নিভে যাওয়া চুরুটটাকে জ্বালিয়ে তুলতে অনর্থক টান দিতে লাগলেন। চুরুট জ্বলল না।

হরেন বাবু বলেন, তা কিছু অত মনে হয় না তবে একটা আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব মনে যে দানা পাকিয়ে ওঠে এটা বেশ পরখ করেছি। যেন এতদিন তো জড়িয়ে রইলে আর কেন? ভোগ তো যথেষ্টই হল, এবারে ত্যাগের কথা ভাব। খুব সময় মত চেক করতে পেরেছি যাহোক। বলে গালে একটা কালো গুলি ফেলে ঢক্ ঢক্ করে দুধ খেয়ে খালি গেলাসটা নাতির হাতে দিলেন—বুঁদ হয়ে গেলেন না।

হরেন বাবু বলেন, আর কিছু হোক না হোক যাওয়ার আগে লালসাটা বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে খাওয়ার লোভটা বেশ বাড়ে। ভালমন্দ সবকিছু চেখে নি—আর ক'দিনই বা এই গোছের একটা চিন্তা অহর্নিশি মনের মধ্যে দপদপ করে—। ভাগ্যিস অভ্যাসটা বদলাতে পেরেছি। বলে ছেঁচা পান খানিকটা গালে দিলেন, দোক্তা খেলেন—পিক ফেললেন না।

প্রকাশ থাকে যে বক্তারা সকলেই পিতামহ মাতামহ প্রপিতামহ প্রমাতামহ এবং নিজ নিজ শক্তির অধিষ্ঠানে এক একটি জাগ্রত শিব।

৫

আরও প্রকাশ থাকে যে :—

তরেনবাবুর শক্তি ছেলে বৌ লইয়া সেবারে তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলেন—বৃদ্ধের উপর ছিল বাড়ি আগলাবার ভার। অধুনা ফিরে মনে প্রাণে সংসার করছেন। উভয়েই এখন তৃপ্ত।

নরেনবাবুর শক্তি মনের মতন যে গুরু পেয়ে ধন্যা হয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি দেহ রেখেছেন বলেই পতিই আবার তাঁর পরমগুরু হয়েছেন। উভয়েই এখন খুশী।

বরেনবাবুর শক্তি এতদিন বাতব্যাধিতে পঙ্গু থাকার পরে উপস্থিত টোটকা করে খানিকটা সুস্থ হয়েছেন, খিটখিটে ভাবটাও বেশ কমের দিকে। উভয়েই এখন শান্ত।

হরেনবাবুর শক্তি প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েদের পৃথক ক'রে দিয়ে বুড়োবুড়ী আলাদা থাকেন। ভাল বাড়িভাড়া পান। সচ্ছলতার স্থিতি অবস্থা। উভয়েই এখন সুখী।

তরেনবাবু নরেনবাবু বরেনবাবু আর হরেনবাবু চারজনেরই এখন স্ব স্ব মনে দৃঢ় ধারণা তাঁদের নাকি আর কোনদিনই হৃদ্‌রোগ হবে না। সম্প্রতি খবরের কাগজে লেখাটা তাঁরা পড়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল—হৃদরোগের ওষুধ প্রেম—হৃদরোগের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে প্রেম করুন। এই মতের প্রচারক একজন মারকিন স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ইউজিন শিম্যান বলেছেন—প্রেম করলে মনে স্ফূর্তি আসে, শরীরও সতেজ থাকে। হৃদরোগ আটকাতে এ দুটি জিনিস ম্যাজিকের মতন কাজ করে। তাই হৃদয় বাঁচাতে হৃদয় দান করুন। তিনি আরও বলেছেন—বেশী বয়সে ঠিক মনের মতন প্রণয়িনী না পাওয়া গেলে মোটামুটি গোছের কারও সঙ্গে প্রেমট্রেম করলেও চলবে।

তরেনবাবু নরেনবাবু বরেনবাবু আর হরেনবাবুর সেদিকে বাধা তো কিছু নেই। নিজেদের বেশী বয়স হলেও তাঁদের স্ব স্ব গৃহে বেশী বয়সের প্রণয়িনীও তো আছেন।

॥ ২৪ ॥

শ্রী মতি বক্সী ও শ্রীমতি বক্সী।

পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের শোয়ে যুগলে সিনেমায় যাচ্ছিলেন।

শ্রীমতি বক্সী পথে যেতে যেতে বললেন, এখনও তো অল্প কিছু সময় আছে। গাড়িটা একটু পাশ ক'রে রাখ তো একবার—ঝট ক'রে একটা পাউডার কিনে নিই। এই দোকানটা থেকে—তুমি যা তাড়া দিলে, পাউডারটাই আনতে ভুলে গেলুম।

দোকানে ঢুকে শ্রীমতি বললেন, একটা ফেস পাউডার দিন তো, চটপট করে দিন, মোটে দেরী করবেন না।

দোকানী সঙ্গে সঙ্গেই কোটি পণ্ডস ল্যাকমী জনসন প্রভৃতি হরেক রকম পাউডার সামনে সাজিয়ে বলেন, কোনটা দেবো বলুন?

শ্রীমতি একটা তুলে নিয়ে দাম জিজ্ঞেস করেন।

সাড়ে পাঁচ টাকা।

না, আর একটু কম দরের দিন। নেই?

এটা নিতে পারেন, ফাইভ ফর্টি।

শ্রীমতি ঘড়ির দিকে চেয়ে নিয়ে পরে বললেন, তবে-ঐটাই দিন।

বলে সাড়ে পাঁচ টাকার পাউডারটি ভ্যানিটি ব্যাগে ভরলেন।

শ্রী মতি বক্সী দাম চুকিয়েএকটি সিগারেট ধরালেন। পরে গাড়িতে এসে বসলে শ্রীমতি বলেন, দেখলে তো আমি কত ইকনমিক ওয়াইফ। দশটা পয়সা যাতে তোমার বাঁচে সেদিকেও নজর দিই—কি কষ্টের পয়সা জানি তো।

কি রকম?

ঐ যে, দোকানী যেই বললে ফাইভ ফর্টি তক্ষুনি সেটা না নিয়ে সাড়ে পাঁচ টাকারটাই নিলুম।

হুঁ। বলে স্বামী ফার্স্ট গিয়ারে গাড়িকে গড়িয়ে স্ত্রীকে বলেন, ক'টা বাজল দেখ তো?

স্ত্রী ঘড়ি দেখে বলেন, ফাইভ ফর্টি।

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে?

সেই আবার এক কথা—ফাইভ ফর্টি মানেই তো সাড়ে পাঁচটার বেশী। কি করে তুমি ওকালতী কর বুঝি না।

কেন? ওকালতীতে ডিফিকাল্‌টি কি? যখন ফাইভ ফর্টিকে সাড়ে পাঁচটার চেয়ে বেশী প্রমাণ করতে হয় তখন জজকে ঘড়ি দেখাই; আবার যখন সাড়ে পাঁচটাকে ফাইভ ফর্টির চেয়ে বেশী দেখাতে হয় তখন টাকা পয়সার হিসাবে সওয়াল করি—।

বাকী পাঁচ মিনিটের পথে দুজনে নীরবেই ছিলেন।

॥ ২৫ ॥

ঘণ্টা পড়ে গেছে অনেকক্ষণ।

প্রোফেসার তখনও আসেননি। বারান্দায় একটা খিলানের আড়ালে আমি ছিলুম এধারে আর ওরা ছিল ওধারে।

সোনালী বলে, তখন থেকে কি এত ভাবছিস্ রে শিউলী? তোরও ভাবনা হয় এ পৃথিবীতে? জেঠু টাকা দেননি না মাসিমা ওংকারকে টেলিফোন করতে বারণ করেছেন?

শিউলী দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বলে, ননসেন্স, ওসব হিউমার এখন ব্যাকডেটেড। কাল নিউ এম্পায়ারে মহুয়া নাচ দেখলুম। কেবল সেটাই চোখের সামনে ভাসছে। কি ওয়াণ্ডারফুল থিমটা। এত ভাল লাগল যে তোকে কি বলব। প্লটটা যেমনি ছোট, তেমনি নিখুঁত আর তেমনি নাইস।

সোনালী বলে, আমিও পরশুদিন দেখে এসেছি।

শিউলী বলে, হ্যাঁ ভাই, তুলনা হয় না। কি চমৎকার! কি লাভলী! সত্যি কিনা বল্? ভাব্, চারিদিকে আঁধার করে বাদল নামছে—ওদিকে দূরে অতিদূরে বহুদূরে মাদল বাজছে—এদিকে মংরু, মানে কিনা যে হিরো, শিকার করতে বেবিয়েছে—শিকার আর পায় না, ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত শ্রান্ত ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত। সমস্ত প্লটটার থিমটা খালি ফলো করে যা। পথের ধারে মস্ত একটা গাছ—অজস্র পাকা মহুয়া ফলের ভারে ঝুঁকে পড়েছে—মংরু নিজেকে চেক করতে পারলে না—লোভ সামলাতে না পেরে গোটা কতক ফল সে খেয়ে ফেললে। মহুয়াতে মাতাল ক'রে দেয় জানিস তো? আর যাবে কোথা, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেসামাল। ঠিক সেই সময়ে ওদিক থেকে তরুণী কাজরী, হিরোইন আর কি, একটা হরিণ ছানা ধরতে ছুটতে ছুটতে আসছে। মংরু হরিণছানাটাকে মারতে তীর ছুঁড়লে কিন্তু হাত তো তার কাঁপছে তখন—তুই প্লটটার আগা থেকে শেষ পর্যন্ত স্টাডি করে যা—মংরুর হাত কাঁপছে—হরিণের গায়ে তীরটা লাগল না। গিয়ে বিঁধল কাজরীর বুকে। তীরবিদ্ধা কাজরীর করুণ আর্তনাদে মংরুর সম্বিৎ ফিরে এল। অনুতপ্ত ব্যথাতুর হয়ে সে কাজরীর দিকে ছুটে দু'কদম যায় আবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়—টলছে তো তখন সে। কাজরীর সামনে

মংরুর চোখে সে কি করুণ মিনতি—ছুটে গিয়েই কোলে কাজরীকে শুইয়ে ফেলে ক্ষতস্থান থেকে বিষটা টেনে চুষে ফেলে দিলে—কত রকম তুকতাক সেবা-শুশ্রূষা করে শেষ পর্যন্ত কাজরীকে সুস্থ করে তুললে—তার পর? তারপর যা ভাবা গেল—ফিনিসটা একটা ফাইন কমেডি। সবটাই সাবলীল ভাবে ফুটেছে—কোন খিচ নেই কোথাও—একটা ডিভাইন জিনিস। আর ব্যাক-গ্রাউণ্ড মিউজিকটাও হয়েছিল তেমনি মারভেলাস্—বল্, ঠিক কিনা?

ভুরু কুঁচকে সোনালী বলে, আরে দূর—একেবারে যাচ্ছেতাই। যাকে বলে ওয়ার্থলেশ মিনিংলেশ টেস্টলেশ বেসলেশ অ্যাণ্ড হোপলেশ। এ পাশ থেকে দেখি একটা মিশমিশে কালো গুণ্ডা গোছের লোক ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে স্টেজে ঢুকল—রেগুলার মাস্কুলার বডি তবু তাকে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা ইব দেখাতে হবে। আগে একটা গাছ না কি দেখালে—আমরা দেখতে পেলুম না। হাত দিয়ে কি পেড়ে খেলে ভগবান জানেন। হেলেদুলে খানিকটা নাচলে কুঁদলে। আর ওদিক থেকে থুপুক থুপুক করে নাচতে নাচতে যক্ষ্মা কালো রোগা ডিগডিগে একটা মেয়ে স্টেজে ঢুকল। হরিণ ফরিণ কিছু দেখলুম না। একজন তীর ছুঁড়ল অপরজন ঢলে পড়ল, এ সেবা করলে, ও চোখ মেললে, তারপর সেই ফিনিশে সেই সনাতন মন দেওয়া নেওয়া। অ্যাডাম্ ইভ থেকে আরম্ভ করে আজকের পাঁচু খেঁদী পর্যন্ত—নায়ক বলে প্রাণেশ্বরী নায়িকা বলে প্রাণেশ্বর। আগাগোড়া একটা মাতলামি—সামথিং ক্রিমিন্যাল। আর মিউজিকটাও যেন ইকোয়ালি রিপালসিভ—পয়সাটাই জলে গেল—আইসক্রীম খেলে ঢের বেশী খুশী হতুম।

সোনালী শিউলীর বিরোধ থাকতে পারেনি কারণ প্রোফেসার ততক্ষণে এসে পড়েছেন।

ছুটির দিনে দুপুর বেলা।

বেলায় খাওয়া চুকেছে। কিঞ্চিৎ গুরুপাকও বটে। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম। ভাইপো নন্তুর সঙ্গে রফা হয়েছিল প্রতি দশটি পাকা চুল তুলে দিলে একটি করে পয়সা পাবে। তাই বেশ খানিকটা অন্তর অন্তর নন্তু ভজিয়ে দিচ্ছিল—কাকু, কুড়িটা হল এবার—কাকু, ঘুমিও না এবারে। উনত্রিশ আর তিরিশ একসঙ্গে দুটো। ঘুমিও না কিন্তু কাকু—শেষে বলবে গুনিনি তো। চুলগুলো ত্যাখা—

আধো ঘুম আধো জাগা অবস্থায় দাদার ঘরের রেডিয়ো কানে আসছিল কিন্তু আদৌ ভাল লাগছিল না। আবার ঘরের সামনের বারান্দায় অযাচিত বাদানুবাদের সূচনা হচ্ছিল যদিও শুরু হয়েছিল শান্ত কথোপকথনে। সব মিলিয়ে বেশ খানিকটা অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিল। যদিও বাড়ির সব ছেলেমেয়েদেরই তো ভাল করে চিনি, কারোরই বয়স দশ-বারো বা বড়জোর তের-চোদ্দর গণ্ডী এখনও পেরোয়নি। ইচ্ছে করেই কিছু বলিনি—গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে। যাক গে মরুকগে, এই গোছের ভাবটা আমার।

কানে গেল—এই দেখেছিস শিপ্রাটা কি গ্রাণ্ড আর এদিকেও মোটে বাইশ—তা ব'ল?

দুর, ওর চেয়ে আর কিছু বেশীতে যা, ফাল্গুনীটাকে দেখ্—ঢের ভাল দেখতে।

না না, ফাল্গুনীটা বা ঐ বাসন্তিকাটা বড্ড যেন গোদা গোদা; চলে না। আজকের সবকটাই তো দেখছি এই রকমের—পছন্দসই তেমন কই?

না তা কেন? অপেক্ষাকৃত কমনীয় কণ্ঠে শুনলাম

এই জয়ন্ত শংকর উদয়ন খারাপ? বলতে হয় না?

হয় এই শিপ্রা না হয় তো ঐ মাধুরী—গড়ন-পিটন ভারী নাইস। আমার দুটোই খুব পছন্দ। যে কোন একটা পেলেই আমি হ্যাপি।

কেন? তোর কুমকুম ইরাবতী রীণা করবী অনুভা চামেলী স্নিগ্ধা কোনটাই পছন্দ হল না?

জোনাকী মিতালী কোনটাই নয়? বলিহারী পছন্দকে।

ইরাবতীটা নট্ ব্যাড—চলে-বল্

আচ্ছা এই এতগুলোর মধ্যে কোনটাকে সবচেয়ে চোখে লাগে বল্ তো—একেবারে টপ?

তা যদি বললি তবে ঐ বিপাশাটাকে, ঐ কোণের বিপাশাটাকে। কি স্মার্ট দেখতে বল্?

কেন ঐ বিপাশাটার পরেই তো তমালী। আমার তো তমালীটাকেই বেস্ট বলতে ইচ্ছে করছে—কত পাতলা গড়ন, কি লাভলী? একেবারে মিস্ ক্যালকাটা বল্! তবে রংটা তো বোঝা গেল না—তাই না?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। পনেরো বছরের ছেলে পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে গিয়েছে, আজকের কাগজের প্রথম পাতার খবর। দশ বারো, কি বড়জোর তের চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ-জাতীয় আলোচনায় অধুনা ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়।

নন্তু চেঁচিয়ে বলে, কাকু, পঞ্চাশটা হ'ল—পাঁচ পয়সা—দাঁড়াও, জল খেয়ে আসি একটুখানি।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় পড়তেই নন্তুর গলা আবার শুনতে পেলাম, ও বুঝেছি—তোমাদের সব বুঝি পুজোয় চাই নোতুন জুতো?

তৃপ্তি পেলাম—নন্তু ফিরে আসবার পূর্বেই আমার ঘুম এসে পড়ল।

।। ২৭ ।।

বিদগ্ধ মধ্যাহ্নের বন্ধ্যা সরণি—

রাস্তায় যেদিকটায় ছায়া পড়েছে ফেরিওলা হেঁকে যাচ্ছিল—সাবা-আন্ তরল আলতা ছাই—মাথার কিলিপ্ কাটা ছাই, হাজলীন পমেটম্ ছাই—আল্ পাকার ফিতা ছাই, শাড়ীকা সেফটিপিন ছাই, কাছ-কাটি ছাই পুতি ছাই গো।

ছুটির দিনে অলস দুপুরে বাইরের ঘরে পড়ে ছিলাম আমার কিছু চাই না তথাপি মনে হল যেন ফেরিওলার গলা খুব চেনা চেনা—সন্দেহভঞ্জনের জন্য ডাকলাম। হ্যাঁ, সত্যিই তো যা ভেবেছি—সেই ছেলেটাই তো বটে। মাথায় তেমনিই আছে, একটুও বাড়েনি! বলি, কি রে, সত্য যে, একেবারে টক্ মিষ্টি ঝাল নোনতা লজেন্স—গরমে পিপাসা নিবারণ করে, হজমের সাহায্য করে, মুখে রাখেন শান্তি পাবেন—দু নয়া পয়সায় একটা আর ছ'পয়সায় চাইরটা থেকে হঠাৎ মাথার ক্লীপ্ কাঁটা চাই—ব্যাপার কিরে, ঠিক বলছি না?

ক্ষণিকের স্তব্ধতার পরে ছেলেটি আমায় চিনতে পারে। সত্যপ্রকাশ সত্য প্রকাশ করে বলে, হ্যাঁ বাবু, ঠিকই কথা—টিটাগড়ের বাসে দেখা হয়েছিল বৎসরটাক আগে—বাবু, আপনার কথা জীবনে ভোলনের নয়। কিছুটা থেমে বলে, সরস্বতী মারা গেছে—তাই লজেন্স আর বেচি না।

আমি বলি, সে আবার কি?

জবাব হল, আমার বুন সরস্বতী হাসপাতালে ছিল—তার কলেরার কথা শুনে আপনি দুইটা টাকা দিয়ে চাইরটা লজেন্স নেন—সেই বাসের কথা বাবু মনে পড়ে? আপনার টাকাটা ডাক্তারবাবুকে এনে দিলাম। শ্যাষ্ ইনজেকসন্ দেওয়া হল, তাও বাবু সেই বুন আমার সরস্বতী বাঁচলো না—তেষ্টায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। আমায় দেখে কি মিনতি—হেই দাদা একটা লজেন্স দে আমারে—আর কখনো চাইব না—পিপাসায় মরে যাচ্ছি—দে দাদা, তোর পায়ে পড়ি—বড় কষ্ট রে। আমার ডাবা ভর্তি লজেন্স ছিল তখন—সরস্বতীরে আমি একটা লজেন্সও দেই নাই—ডাক্তার বাবুর বারণ ছিল। লজেন্স দিলাম না কিন্তু বুনও বাঁচলো না। সরস্বতীর চিতাতে সব লজেন্স উজাড় করে ঢেলে দিয়ে বুনকে ডেকে বলে এসেছি—খা বুন্, সব লজেন্স খেয়ে ফ্যাল, প্যাট্ ভরে খা। আশ মিটিয়ে

খা—ডাক্তারবাবু এখানে তো নেই—কেউ তোরে বকা দেবে না এখন। আজও বাবু আমি শুনতে পাই—একটা লজেন্স দে দাদা, তোর পায়ে পড়ি। বড় কষ্ট রে দাদা, আর পারি না থাকতে—। আর কখনও চাইব না। তার পর থেকেই আর লজেন্স ছুঁই না। ছুঁই না তো ব্যাচবো ক্যামনে। সাবান বেচে প্যাট চলে না বাবু—সকলেই দোকানে যায়—আমারে কেউ ডাকেই না—খামকা ঘুরেই মরি—তবু লজেন্স বেচে কোন রকমে প্যাট চালাতুম—বুন আমার নিজেও মরছে—আমারেও মাইর‍্যা গ্যাছে।

একটা টাকা দিতে গেলুম—সে এবারে নেয়নি। বলে—আর লাগবো না বাবু, রাখেন।

ম্লান হাসি হেসে ধরা গলায় সত্যপ্রকাশ হাঁকতে হাঁকতে চলে গেল—সাবান্ তরল আলতা ছাই—মাথার কিলিপ কাটা ছাই—

শুয়ে শুয়ে ভাবি এ-জাতীয় সত্য ক'টাই বা প্রকাশ পায়!

কুমার কুমার কুমার অফ কুমারগাছি—

সুদৃশ্য ভিজিটিং কার্ডে সুন্দর ভাবে লেখা। হাতের ·কাজ গোছগাছ করে উঠতে যাব—বেয়ারা কার্ডটা দিয়ে গেল।

কে যেন এই ভদ্রলোকটি হতে পারেন ভাবতে ভাবতেই আগন্তুক ঘরে ঢুকেই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে মাথা একটু নুয়েই বলে, চিনতে পারো দাদা ?

সঙ্গে জনা-সাতেক সাঙ্গোপাঙ্গ ঢুকে পড়লো।

ও তুমি ? ন্যাড়াবাবু ? তাই বল—আমি ভাবলুম কে যেন এই মহাপুরুষটি হতে পারে—নামটা পড়ে আমি তো তাজ্জব। জব্বর হয়েছে কিন্তু নামটা—কুমার কুমার কুমার—আবার অফ্ কুমারগাছি—বেশ রিদম্ আছে—শ্রুতিমধুর—যেন সেই

হরির উপরে হরি, হরি শোভে তায়
হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়

তা মিথ্যে তো কিছু বলিনি ওতে—প্রথম কুমারটা আমার আসল নাম—দ্বিতীয় কুমারটা নাথ চন্দ্র কৃষ্ণ ভূষণ শঙ্কর জাতের, তৃতীয় কুমারটা আমার পদবী—ফ্যামিলির সারনেম। আর কুমারগাছিতেই তো আমাদের বাড়ি—যেখানে মাছ ধরতে গিয়ে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়।

বসতে বলে বলি, তা ব্যাপারটা কি বল তো ? হঠাৎ এই অবেলায় ভাঙা হাটে কেন ? কতকাল পরে দেখা হল।

মাথা নেড়ে হেসে বললে, তিনটে টেক্কা চাই,—তিন রংয়ের তিনটে টেক্কা তোমাকে ঠিক করে দিতে হবে দাদা—এ আর কারোর দ্বারা হবে না—তোমার কত জানাশোনা কত পরিচয় কতজনের সঙ্গে।

বলি, খুলেই ব'ল না।

বলে. একটা রাজনীতিতে, একটা ছায়াছবিতে আর একটা সাহিত্যজগতে—বাস্ এই হলেই—

বলি, নোবেল প্রাইজ দেবে নাকি ?

আরে দূর—একটা উদ্বোধক, একটা সভাপতি, একটা প্রধান অতিথি—তিনটেই

যেন সাচ্চা হীরে হয় এই হচ্ছে আমাদের—

বলি, কবে, কোথায়, কেন ?

বলে, কাঁসারীপাড়ার মাঠে সাজাহান প্লে করছি—তিনটে দিকপাল চাই—রাঘব বোয়াল গোছের—নো চুনোপুঁটি এবং নো শাল শোল ল্যাঠা—মাসখানেক সময় আছে এখনও।

বলি, তা অফ্ অল পার্সেনস্ এ অধমের কাছে কেন ভাই ?

কারণ এই যে ঐ তিনটে ব্যাস লাইনই একটি মাত্র কেন্দ্রবিন্দুর মধ্য দিয়ে পাশ করছে বলে—আর সেই বিন্দুটিই যে তুমি—বলে আমার দিকে আঙুল দেখালো।

বলি, কেন আর লজ্জা দাও—এসেছো বসো, দুটো হেঁসে কথা বল, চলে যাও—ছলনা ফলনা ছাড়ো দিকি। আমার কি আর সেদিন আছে—সেই যে বলে না ? দিন যত গত তত দীন দিনপতি—আমার সেই অবস্থা।

বলে, ওসব ভাঁওতাবাজীতে ভুলছি না—এক একটা করে বলি কেন অফ্ অল্ পার্সেন্স্ তোমার কাছে এসেছি—প্রথমেই ধরো রাজনীতি, নম্বার ওয়ান, তুমিও তো সেবারে স্বতন্ত্র নির্দলীয় ক্যানডিডেট হয়ে তোমার কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিলে, মনে পড়ে ? হারো আর জেতো, সে আলাদা কথা—সেটা তো নসিব—রাজনীতি করি না জানি না বুঝি না এসব কেউ মানবে এখনও ? বল ?

বলি, খানিকটা অর্থনাশ কপালে ছিল তাই ঐ দুর্মতি হয়েছিল সেবারে—জীবনে আর না।

সেকেণ্ডলি—মিছিল ছবিতে ভীড়ের মধ্যে ডোরাকাটা সার্ট পরে কার ছবি সামনে উঠেছিল বাবু—মুনমুন প্রোডাক্সনের মিছিল ছবির কথা মনে পড়ে ? এখনও বল ছায়াছবি করি না জানি না বুঝি না—এ সব কেউ বিশ্বাস করবে এখনও ?

বলি, আহা সে তো মৃত সৈনিকের পার্টের মতন—সেদিন ওখান দিয়ে যাচ্ছিলুম—ওরা একটা মব্সিন্ তুলছিল—ডিরেকটার মুখচেনা—জোর করে দাঁড় করিয়ে দিলে আমাকে—তাই ছবি উঠে গেল—কোন কথা বলেছি কি সেখানে ?

নেক্সট্, খবরের কাগজে কার লেখা বেরিয়েছিল—ট্যাক্সি ড্রাইভারের সততা—'সুটকেশ ফিরাইয়া দিয়াছে—ভিতরের টাকাকড়ি কাগজপত্র কিছু খোয়া যায় নাই,—' এবারেও বল সাহিত্য করি না জানি না বুঝি না—কেউ শুনবে তোমার কথা ?

বলি, ওটা তা সম্পাদক মশায়কে চিঠি দিয়েছি—ওতে আবার সাহিত্যের কি আছে?

ন্যাড়াবাবু কিছুতেই বুঝবে না। উঠে এসে হাত দুটি ধরে বলে, জোর গলায় ব'লে এসেছি ক্লাবে—আমার মুখরক্ষা ক'রে দিতেই হবে—প্রেস্টিজ ঝুলে যাবে—মুখে চুনকালি পড়বে আমার—বলে কাতর নয়নে আমার দিকে তাকালো।

আমাকে গলানোর পক্ষে যথেষ্টই তাপ ছিল—তা না হলে কেন বলি, তা তারিখ ডেট্‌টা আর টাইমটা ঠিক ক'রে ব'ল এখন।

বলে, আজ তো হ'ল আটাশে তারিখ—ধরো সামনের মাসের আটাশে—রবিবার পড়ছে—প্রভিসানালি ঐ তারিখেই।

দেখি কি করতে পারি—বলে তাকে তখনকার মতন থামা দিলুম—তুমি টাচে থেকো—মধ্যে মধ্যে খোঁজ নিয়ে যেও—কি রকম ডেভালপমেণ্ট হয় দেখে যেও—দেখি তোমার কপাল আর আমার হাতযশ কেমন একবার পরখ করে—

নিশ্চয় নিশ্চয়, একশোবার—বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বলেও গেল, না আসতে পারি রেগুলারলি—টেলিফোন তো করবই—

বলি, হ্যাঁ, চারটের পরে আর ছটা সাতটার মধ্যে—তিন তিনটে দিকপালকে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজী করানো—আর সময় তো মাত্র মাস খানেক—খুব সোজা কাজ নয় তা ন্যাড়াবাবুও বোঝে—আমিও বুঝি—সকলেই বোঝে।

ভাবি পয়সা তো লাগছে না—দেখি একটু চেষ্টা করলেই যদি কারোর উপকার হয় আর বহুজনের তৃপ্তি হয় তবে চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি? না পারি—বলে দেবো পারলুম না ভাই।

রাজনীতির রা বাবুর কাছে কথা পাড়তেই সে প্রথমে চুপ করে শুনলে—সব শুনে হেসে বলে—তাই বুঝি—তা আমায় আবার টানাটানি কেন ভাই—আমার সময় কোথা? অতদূর পথ বলছো—বনবাদাড় তো নিশ্চয়ই—আমায় বাদ দেওয়া যায় না?

বলি, তুমিই তো এখন নেতাদের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষ শিখরে—অস্বীকার করতে পারবে—অমান্যি যাবে কি? জনতা চায় তোমায় দেখতে—দু'কথা শুনতে।

ওষুধ লাগল মনে হয়।

বলে, তাই বুঝি! আচ্ছা ডেটটা বল দেখি—মাসখানেক দেরী আছে বলছো তো—মধ্যে এসে খোঁজ নিয়ে যেও কিন্তু—যদি না বিশেষ বড় কিছু

ঝামেলায় আটকে যাই—দেখবো। ইতিমধ্যে দিল্লী না ছুটতে হয় আমাকে।

বলি, দেশের স্বার্থে দশের কাজে একটুখানি না কষ্ট করলে চলবে কেন? আবার তো ইলেকশন আসছে।

দেশের কাজে দশের স্বার্থে বললে, তাই বুঝি? তা তোমার এলাকাটা কোথায়—ওখানকার লোকজন কেমন?

বলি, কলকাতার পাশেই বলতে গেলে।

তাই বুঝি? তা কবে যেন বললে তারিখটা? সন্ধ্যায়?

তাও বলি, মোটামুটি ধরো মাসখানেক পরে—সন্ধ্যার দিকে।

তাই বুঝি? বেলা তিনটে সাড়ে তিনটেয় হয় না? বেলা থাকতে থাকতে—দিনে দিনে যাবো আর দিনে দিনে ফিরবো?

বলি, তা কি করে হয়—ওদের ফাংসানে একটা নাট্যাভিনয় হবে—হতে করতে ধরো সাতটা তো বটেই—বেলা তিনটেয় ফাংসান শুরু করে চার ঘণ্টা সবাই করবে কি? ঘাস ছিঁড়বে?

তাই বুঝি? তা নাট্যাভিনয়ের আমি কি উদ্বোধন করব? বলবোই বা কি?

দেশের নেতাকে কি বলে দিতে হবে বলবে কি? হাতে একটা মাইক পেলে তো কথার ফুলঝুরি ছোটাও। থামাতে পারা যায় না।

তাই বুঝি? তা এসো, দেখবো চেষ্টা করে—খুব ভরসা দিতে পারছি না কিন্তু—একটা স্থানীয় ডুপ্লিকেট উদ্বোধকও ঠিক করে রেখো বাপু—আর অন্তত দিন সাতেক আগে ফাইন্যাল করে যেও, নয়তো আমি ধরেই নেবো বাতিল হয়ে গেছে—পরে দোষ দিও না—আমি যাব না তখন ডেফিনিট। যাব না মানে যেতে পারবো না।

ছায়াছবির ছাবাবুকে টেলিফোনে কিছুতেই পেলুম না। তিন দিন তিন সময়ে গিয়ে শেষে ধরতে পারলুম। সপ্তকাণ্ড শুনেটুনে বললে, তাই তো, মহা ফ্যাসাদে ফেললে বন্ধু তুমি—এখন এতো হাতে কাজ—একটা দিনও ফুরসুত পাই না—তা কবে যেন বললে তারিখটা? হয়ে গেছে?

বলি, সে আবার কি কথা? ধরো ফোর উইক্‌স্‌ এখনও—তোমাদের নামটাম দিয়ে ডেট্‌টা ফাইন্যাল ক'রে বলে যাবোখন—বেশ কিছুটা সময় হাতে রেখে।

তাইতো, ডেটই ঠিক হয়নি এখনও বলি—কি করে?

বলি, প্রায়ই ঠিক—ধরো ফোর উইক্‌স্‌।

ডায়েরী দেখে বলে, তাই তো, যদি না ঐ সময়ে বম্বে চলে যাই। ওখানেও দুখানা বই হচ্ছে তো। তাই তো, মহামুস্কিলে ফেললে দেখছি তুমি—তা কখন যেন বললে?

বলি, সন্ধ্যায় ফাংসান।

তাই তো, একটু রাত করে হলে হতো—দশটা-ফশটায় হয় না? আমরা আবার দিনের আলোয় বেরনো পছন্দ করি না।

বলি, কি যে বল—তুমি সভাপতি, সভার শুরুতেই তো তোমার কাজ—রাত দশটায় তো নাটক মাঝগঙ্গায়।

তাই তো—তা বাপু, নাটকের ব্যাপারে সভাপতি রোলে আমার পার্টটা কি হবে?

বলি, সভায়া পতি না তো সভায়াম্‌ পতি? হয় সভার পতি না হয় তো সভাতে পতি।

তাই তো, বললে ভাল।

বলি, তা ছাড়া বড় গাছই তো ঝড়ের ধাক্কা সামলায়; মহীরুহ বলে কথা!

তাই তো, বড় গাছেই তো বাজ পড়ে আবার—আচ্ছা তারিখটা লিখে রাখি তো এখন—হাতে সময় থাকতে রিমাইণ্ড ক'রে দিও।

বলি, সে কি আর বলতে হবে? তোমাদের সময়ের দাম কত!

তাই তো—সভাপতির গাড়িতে ঢিলটা পাটকেলটা ছুঁড়বে না তো আবার—আমার নতুন গাড়ি।

বলি, দূর, তোমাদের আদর কত!

তাই তো—ওই ফ্যানেদের কথাই বলছি।

বলি, ওসব কিছু ভেবো না—ওদের গাড়ি আসবে নিতে।

তাই তো—নিয়ে যাবে শুধুই নয়—আবার দিয়ে যেতেও হবে কিন্তু—ভাল করে বলে দিও—নয়তো বিদেশ-বিভুঁয়ে বেঘোরে প্রাণটা যাবে।

বলি, তা আর বলতে?

তাই তো—বেশ—তবে একটা ওখানকার ছোটখাটো হাতমুটকো সভাপতিও ঠিক করে রেখো।

বলি, কেন?

তাই তো—কেন আবার জিজ্ঞেস করছ—কারণ খুব বেশী ভরসা দিতে

পারছি না যে—তবে অ্যাটলিস্ট এক উইক আগে ডেট ফিক্সড করে যেও নতুবা ফলং মড়কং জানবে।

শেষবেশ সাহিত্য-জগতের সা বাবুর কাছে গিয়ে দেখি সকাল বেলা আলোয়ান মুড়ি দিয়ে জুজুবুড়ি হয়ে বাইরের ঘরে বসে কাগজ দেখছিল—আমার কাছে সব শুনে-টুনে বললে, তথাপি আমাকেই চাই—লেখক তো আজকাল গণ্ডা গণ্ডা—অলিতে-গলিতে।

বলি, প্রধান অতিথি বলে কথা—একটা কচি ও কাঁচাকে দিয়ে কি হয়—একজন নামী ও দামী লোক চাই যে—বুঝছো না?

তথাপি আমার নিজের যাওয়ার দরকার হচ্ছে কেন বুঝছি না; একটা ভাষণ লিখে দিচ্ছি—পড়ে দিও না এখন—এই তো সেবারে—

বলি, এ তাহলে তো মার্ মার্ কাট্ কাট্ হয়ে যাবে—কার ভাষণ কে পড়বে আর কার পড়া কে শুনবে—?

তথাপি আর যাই হোক, আমার তো রেহাই হবে—নাকি?

বলি, তা হয় না—তোমাকে মালা পরাবে—তোমাকে লোকে দেখবে—তোমার কথা শুনবে—তোমাকে তারিফ করবে—তোমার জয়গান করবে—তোমাকে ধন্যি ধন্যি করবে—তোমার সই নেবে—তবেই না জমবে জিনিসটা।

তথাপি আমার নিজের যাওয়ার ঝামেলা বিলক্ষণ—দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাহিত্যের দাম দেয় কে? বক্তারই ডিমাণ্ড—সুবক্তাই হোক আর কুবক্তাই হোক—ভীড় কত হয়?

কি যা-তা বলছো? সাহিত্যিক বলে কথা—তোমার কলমের খোঁচায় জনমতের মোড় ঘুরিয়ে দিতে কতক্ষণ? তোমার যাওয়ার বিশেষ একটা ওয়েট আছে জানবে—আমি বলি।

তথাপি আমি ভাল বুঝছি না—অজানা জায়গা—অচেনা পরিস্থিতি—হাজার তোমরা থাক পাশে পাশে—তথাপি মন আমার সায় দিচ্ছে না—হাঁপানীটাও বাড়বে।

বলি, ঠাণ্ডা লাগবে কেন—তুমি ভাষণ দিয়েই চলে এসো। কি দরকার তোমার অভিনয় দেখার?

তথাপি আমি নিরুৎসাহ কাউকে করছি না—একটা রেকর্ডিং করে আমার বাণী গোছের একটা কিছু নিয়ে যাও না? সেখানে বাজিয়ে শুনিও—বেশ না হয় গুছিয়েই বলবো'খন।

বলি. সে তো দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো হবে।

তথাপি তুমি যখন ছাড়ছো না—রাজী হচ্ছি বটে—তবে সাবজেক্ট্ টু অলটারেশন্—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

বলি, তার মানে?

তথাপি ঐ এলাকার একটা ছোটখাটো লিখিয়েকেও যোগাড় করে রেখো হাতের কাছে—হুট্ বলতেই যাকে পাওয়া যায়—আর অন্ততপক্ষে হপ্তাখানেক আগে সঠিক বলে যেও নতুবা জানবো আমায় যেতে হবে না—অন্য ব্যবস্থা করতে হবে তোমাদের—তখন পাদমেকম্ ন গচ্ছামি হবে।

ন্যাড়াবাবু পরের বারে এসে সবকিছু শুনে আহ্লাদে আমাকে জড়িয়ে বলে, "দাদা, তুমিই বাঁচালে মোরে আজি এ সমরে, মহারণক্ষেত্রে এবে। হায় রে যেমতি পাঞ্চালীর লজ্জা ঢাকে শ্রীমধুসূদন, তেমতি রে—"

বলি, এটা আবার কোথা থেকে আওড়ালে? আছো বেশ?

বলে সেলফ্ মেড ডায়ালগ্—এরকম আমি গড়গড করে বলে যেতে পারি। আরও শুনবে?

বলি, না না না না না—পরে শুনবো। হাঁড়ির একটা ভাত টিপলেই তো বোঝা যায়।

ঠিক হ'ল অন্তত সাতদিন আগে ফাইনাল ইন্‌ভিটেশন কার্ডগুলি যেন আমার হাতে এসে পৌঁছয়—এরা অতিমানব এই মহাপুরুষদের অতি অবশ্য সাত দিন আগে না রিমাইণ্ড করে এলে কেউই যাবে না আর যাতায়াতের সমস্ত ব্যবস্থাও ন্যাড়াবাবুদের সামলাতে হবে—শান্তি শৃঙ্খলা নিরাপত্তা রক্ষার সকল ভার তো বটেই অধিকন্তু দক্ষিণ হাতেরও ভাল গোছের আয়োজন।

ন্যাড়াবাবু পিঠের শিরদাঁড়াটা প্রায় নব্বই ডিগ্রীতে হেলিয়ে চলে গেল।

পক্ষকাল প্রায় কেটে গেল, ন্যাড়াবাবুর সাড়া নেই। সমস্ত উদ্দীপনা উত্তেজনা উত্তাপ ক্রমশ যেন নিরুত্তাপ নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হতে চলেছে।

ভাবি ঘটা করেই ধুমধাম্ হচ্ছে বোধ হয়—ঠিক সময়ে ঠিকই খবর দেবে কিন্তু আমার ভাবনার শেষ নেই—এদিকে আবার তিন-তিনটে দিকপাল—সকলেই তো শাসিয়েছে অন্তত হপ্তাখানেক আগে পাকা ডেট যদি না দিতে পারি তো কেস হোপলেশ হবে—চিকিৎসার বাইরে চলে যাবে—

ন্যাড়াবাবুকে বলিনি বটে তবে আমার মনে হয় ডেট্ দিলেও যে বিশেষ আশাপ্রদ হবে তা নয়—তখন বলবে, কি করব ভাই চেষ্টা তো করেছিলুম—ওপর-

ওয়ালার ইচ্ছা তো সবার উপরে। মানুষের ক্ষমতা কতটুকু ?

চতুর্থ সপ্তাহে শেষের দিকে ন্যাড়াবাবু ধূমকেতুর মতন দেখা দিয়ে বলে, দাদা, তীরে তরী ডুবলো। দিল্ আমার টুকরো টুকরো হয়ে গেছে—কথা বলতে পারছি না—এক কাপ চায়ের কথা বলে দাও আগে—কফি পাওয়া যায় এখানে ?

জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে থাকি।

বলে, ওই শাজাহান ইস্যুতেই হারলুম দাদা।

বলি, সে কি ?

বলে সব কিছু ঠিকঠাক—যাকে বলে পারফেক্ট্‌লি পারফেক্ট্—হল কি, শাজাহানের পার্টে দুটি রাইভ্যাল জুটলো, দুটোই জাঁদরেল, দুটোই জবরদস্ত, দুটোই মোক্ষম—একজন আমাদের থানার দারোগাবাবু স্বয়ং, অপরজন কাঁসারি পাড়ার মোড়ল মশায় আর তিনশ টাকার ক্লায়েন্ট। একজন ভায়োলেন্ট অন্যজন নন-ভায়োলেন্ট—একজন ভয় দেখালে, আমায় বাদ দিয়ে প্লে করলেই শাজাহানকেই সঙ্গে সঙ্গে স্টেজ থেকে তুলে নিয়ে থানায় লক্ আপে ভরবো—চুরির চার্জে ধোলাইও দেবো এমন ব্যাটাকে পরলোকে শাজাহান প্লে করিয়ে ছেড়ে দেবো। ...আর একজন, মানে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি শাসালে, ফাংশানে একটি পয়সা তো দেবোই না উল্টে সারাক্ষণ আমাদের লোকেরা হাঁড়ি ঠক্ ঠক্ ঠুকবে—সমস্ত ডায়ালগ তখন মূক অভিনয়ে দাঁড়াবে—বুঝবে ঠ্যালাটা ; আমাকে বাদ দেওয়ার ফলটা তখন—দর্শক ইট ছুঁড়বে, বোমা ফাটাবে, স্টেজ জ্বালিয়ে দেবে। এ যুগের দর্শক—মনে থাকে যেন। পয়সা খরচা করে তোমাদের সং দেখতে আসবে না।

বলি, তারপর ?

তারপর আর কি ? বই বদলাবার চান্সও তখন নেই—অন্য অ্যাক্টরেরা বেঁকে দাঁড়ালো। কিছুতেই রাজী নয়। অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'ল একটা বিরাট বনস্পতি—মানে একটা মহান মহীরুহ। এ পোড়া দেশে কি কিছু একটা ভাল কাজ করবার জো আছে—আমার আরও দুঃখ হয় শুধু শুধু তোমাকেও কত খাটালুম দাদা—সবই বেফয়দায়—আবার সকলকে বলে আসতে হবে তো—এবারে টেলিফোন ক'রেই না হয় জানিয়ে দাও—তোমার কি জ্বালা বল—বিশ্বাস ক'র, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি এতটা গড়াবে গুরু।

ন্যাড়াবাবু চলে গেলে ভাবি ভগবান যা করেছেন ভালই করেছেন—ইট ছোঁড়া, পেটো ফাটানো, স্টেজ জ্বালানো হত নিশ্চয়ই আর সমস্তটার জন্য ওরা সকলেই দায়ী করতো আমাকে—উদ্বোধক সভাপতি প্রধান অতিথি কেহই যেতো না,

কেবল আমার মুখের উপরে অনুরোধ চক্ষুলজ্জার খাতিরে প্রত্যাখান করতে পারেনি এই পর্যন্ত—আর আমিও ন্যাড়াবাবুর ভবিষ্যৎ অনুরোধের হাত থেকে নিজেকে এবার বাঁচাতে পারব। একটা কেস ল'য়ের রেফারেন্সও অন্তত হাতে রইল।

ভগবান যা করেন—সত্যিই মঙ্গলের জন্যে।

রাজনীতির রা বাবুকে তার শ্বশুরের উইলের প্রোবেট নিতে পরে আমার কাছে আসতে হয়েছিল—করেও দিয়েছিলুম—দক্ষিণাও দিয়েছিল; কিছু কন্‌-সিডার করতে অনুরোধ করেনি বোধ হয় সে ধরেই নিয়েছিল সে নিজে তো আমার অনুরোধ রাখেনি—আমি যদি না রাখি।

ছায়াছবির ছা বাবুর ব্রীচ অফ কন্‌ট্রাকটের মামলা আমিই করে দিয়েছিলুম—শেষটায় সোলেনামায় বলা হ'ল যে যার খরচা বইবে। ছা বাবু আমার পুরো কস্ট দিয়ে গেছে, কোন রিকোয়েস্ট্‌ করতে সাহস পায়নি—আমি রাখবো কি রাখবো না ভেবে। সে নিজে তো জানেই, আমার রিকোয়েস্ট সে রাখেনি।

সাহিত্যের সা বাবু বিধবা শালীকে বাড়ি কিনে দিয়েছে আমারই হাত দিয়ে—আমার প্রাপ্য পুরোই পেয়েছিলুম। কিছু কমসম নাও বলতে ভরসা পায়-নি; কে জানে, ওর কথা আবার আমি রাখবো কিনা, যেখানে আমার কথা ও যে একদা রাখেনি, সেটা তার মনে ছিল।

ন্যাড়াবাবু আরও দু-একবার এসেছিল—আমি ঘ্যাড়ায় নি—বলি, তিন-তিনটে রাজা-উজীরের কাছে একবার আমার মুখ তো পুড়িয়েছো— আর কেন?

চিঠির পরেই চিঠি—

ডাক্তার সামন্ত পর পর পাঁচটি চিঠি দেশ থেকে পেলেন—দেশের পিতামহী বারে বারে দুঃখ করে লিখছেন নাতি তাঁর অত বড় চোখের ডাক্তার হয়েও তাঁর স্বর্গে বাতি দেবার কি ব্যবস্থা করেছে। একবারও কি একদিনের জন্য গিয়ে তাঁর চোখটি দেখবার সময় হচ্ছে না? ছানি কাটিয়েছেন ঠিকই তাও সেই নাতিরই কথামত। কিন্তু শুধু পরামর্শ দিয়েই কি নাতির কাজ ফুরলো। চোখ কাটিয়েছেনও আজ প্রায় বৎসর ঘুরতে গেল; আর কিছু ভাল করা যায় কিনা, তাও কি নাতির দেখার কথা নয়? আজ সত্য বেঁচে থাকলে শান্তা কখনই এরূপ অশ্রদ্ধা করতে সাহস পেত না। শান্তা ডাক্তার সামন্তেরই নাম এবং তাঁর পিতা সত্য যে ঐ পিতামহীরই কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র এও সত্য।

পরের রবিবার সব কাজ ফেলে ডাক্তার বাড়ি গিয়ে দেখলেন পিতামহী রোদে পিঠ পেতে রোয়াকে বসে চাল বাছছেন।

একথা সেকথার পরে পিতামহী বললেন, ত্মাখ্ শান্তা, চোখ কাটালুম বটে তবে ঠিক তেমনটি দেখতে পাই না।

ডাক্তার বললেন, তাই নাকি? কি রকম?

পিতামহী মাথা তুলে অনুসন্ধিৎসু নেত্রে এধার ওধার চেয়ে বলেন, ঐ ত্মাখ্ না ঐ বেড়ালটা দেখছিস্।

ডাক্তার বললেন, কোথায়? কোথায় আবার বেড়াল? কৈ?

পিতামহী বললেন, ঐ যে রে, ঐ হলদে বাড়িটার ছাদটার পিছনে যে লাল বাড়িটা দেখতে পাচ্ছিস, সেই লাল বাড়িটার বাঁ পাশে ঐ যে নারকেল গাছটা আছে—একটু ব্যাঁকা মতন গাছটা—তার পাশে ঐ যে সাদা বাড়িটার চিলের ছাদে ঐ যে সাদা বেড়ালটা বসে ন্যাজ নাড়ছে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি বটে কিন্তু তার ঐ হলদে ন্যাজটা বেশ যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না। হাসপাতালে ছানি কাটতে কোন ভুলচুক করে ফেললে নাকি রে ছোকরা ডাক্তারটা। তুই কলকাতায় কাটালেই তো পারতিস বাপু। কতবার তো বললুম—শুনলি না।

ডাক্তার মল্লিক, যিনি অপারেশন করেছিলেন তিনি ডাক্তার সামন্তর বিশিষ্ট

বন্ধু এবং নামও করেছেন।

ডাক্তার সামন্ত বললেন, হলদে বাড়িটা তো বুঝলাম, তার পেছনে লাল বাড়িটা—তার পাশে গাছ—একটু বাঁকা মতন—গাছের পাশে সাদা বাড়ি—সাদা বাড়ির টিলের ছাদ—টিলের ছাদে সাদা বেড়াল—সাদা বেড়ালের হলদে ন্যাজ—সে ন্যাজ নাড়ছে বুঝি? ঠিক বলছো তো? দাঁড়াও আমি আগে ভাল করে দেখি খানিকটা। পরে ডাক্তার সামন্ত বলেন, কৈ, আমি কিন্তু বেড়াল-টেড়াল কিছু দেখতে পাচ্ছি না—তুমি দেখতে পাচ্ছ বলছো অথচ ভাল দেখতে পাচ্ছ না—তখন ঠিকই বলছো—ঠিকই হয়েছে—চোখটা ঠিকই কাটা হয়েছে তবে কি জান এখানকার ব্যবস্থা তো—ও খুঁতটুকু এখন কিছু-দিন থাকবেই—ওতে খুঁত খুঁত করো না—সারবে তবে সময় নেবে। আমি কিন্তু আজ বিকালের ট্রেনেই ফিরবো—থাকা আর মোটেই চলে না।

রবিবার কাটিয়ে সোমবার ফিরবেন পূর্বে ডাক্তারের এইরূপ ইচ্ছাই ছিল।

রণেনবাবুর আজ অফিস নেই, তিনি জামায় বোতাম বসাচ্ছিলেন।

ঘর্মাক্ত-কলেবরা স্ত্রী রক্তমুখী নীলা বাড়ি ফিরলেন যাবতীয় কেনা কাটা শেষ করে—পুজোর দেরী নেই এবং বোনাসের টাকাও পাওয়া গেছে।

ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন, ইলা নেমন্তন্ন করতে এসেছিল না?

হ্যাঁ, এক ভদ্রমহিলা বললেন, তোমার বাল্যবন্ধু তাঁর ছেলের ভাতের খাওয়া, রবিবার—তেইশ তারিখে দুপুর বেলায় ফাংশান—আমাদের কিন্তু যেতে বললেন রাত্রিতে।

জানি জানি সব জানি—অত ফেনিয়ে বলতে হবে না, রাস্তার মোড়ে দেখা হ'ল—বললে, নীলু তোর কর্তাকে বলে এলুম। ভদ্রলোক তো দেখলুম খুব টিমিড্—নিপাট ভাল মানুষ—নিরীহ শান্তশিষ্ট গোবেচারা টাইপের।

নতমুখে সেই যে লক্ষ্মণ ঠাকুরপোর মতন দাঁড়িয়ে রইলেন আমার কথাগুলি কি শুনলেন কি বুঝলেন জানি না। যাই হোক তোর সঙ্গে দেখা হ'ল তাই রক্ষে আর বাঁচোয়া—চিঠি পড়ে তো ধরতেই পারতিস না। বাসা বদলেছি তায় আবার আমার ভদ্রলোকটির নামও মনে আছে কি না জানি না।

স্বামী বলেন, তাই নাকি? আমাকে কত বড় কমপ্লিমেণ্ট দিয়ে গেলেন বল তো তোমার বন্ধুটি—যা তুমি আজ পর্যন্ত কোন দিনই আমাকে দিলে না।

কমপ্লিমেণ্ট না ছাই—ডিসকোয়ালিফিকেশন মানে ফেল—তুমি আর এ পৃথিবীতে স্মার্ট হ'তে পারলে না এ জীবনে। এমন রিডিকুলাস পোজিশনে ফেলে দাও আমাকে যে প্রেস্টিজ পাংচার।

তা যা বলেছ—তোমারও আর এ জীবনে এ পৃথিবীতে কোন বন্ধুর কাছে শোনা হ'ল না—বাব্বাঃ তোর বাড়ি যাবো কি? তোর কর্তা যা ক্ষুধিত দৃষ্টিতে প্যাট প্যাট করে লেহন করলেন, আমার পেটের কথা মুখেই এলো না। নিদেনপক্ষে এমন একটা মোলায়েম কথাও শুনতে পেলে না যে তোরটিকে বাপু কি রকম যেন কেমন কেমন মনে হ'ল—পরকীয়া প্রীতিটা যেন বড্ড বাড়াবাড়ি গোছের ঠেকলো—ওভার অ্যাকটিং। সেই মনে পড়ে, লোড শেডিং সময়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে বলেই ফেললেন—আপনি আমার হাতটা চেপে ধরে ধরে নামুন—তাতে কি হয়েছে?

॥ ৩১ ॥

তিরিশ বছর পরে একঘণ্টা।

—অ—অ—অঞ্জু? অঞ্জলি না?

—আরে? তুমি শিবেন? কোত্থেকে গো?

—আমারও তো' ঐ একই জিজ্ঞাসা।

—চিনতে পেরেছো তাহ'লে?

শিবেন নিজের থুতনীর ডান দিকে আঙুল রাখে; বলে, ও কি ভোলা যায়! অঞ্জলির ওখানে একটা তিল ছিল, একটু বড় গোছের—

অঞ্জলি হাসে, কত দিন পরে বল তো?

—দিন কেন? বছর বল—প্রায় তিরিশটা বছর—বেশী বই কম নয়।

—তা হবে বৈকি—জেঠু মারাই তো গেছেন প্রায় তিরিশ বছর হল।

—কিন্তু, তুমি আমায় কি ক'রে চিনলে? শরীরে মেদাধিক্য হয়েছে—মাথাটাও তেলচকচকে ক্লীন হয়ে গেছে—বাহাদুর চোখ বলতে হবে!

—তোমার ঐ অ—অ—অঞ্জু ডাকেতে—ও ডাকে আমায় ডাকেনি তো কেউ এ পর্যন্ত।

—তারপর? দিল্লী থেকে প্রচারিত সংবাদ বাংলায় রীলে ক'রে শোনাও কিছুটা।

—খবর আর কি? ওখানে তো একেবারে সেটেল্‌ড্‌ হয়ে গেছি—এবারে অতি কষ্টে রাজী করিয়ে এক মাসের কড়ারে মেয়ে-জামাইয়ের কাছে যাচ্ছি নিউ আলিপুরে। তুমি? মানে তোমরা?

—বিপরীতগামী—কিছুদিনের জন্য রাজগীর যাচ্ছি হাওয়া খেতে।

—ছেলেমেয়ে?

—একটি ছেলে, ডেরাডুনে আছে।

—তা, বেটার হাফটি?

—বেটার হাফটি তো মুখ বাড়িয়েই আছে গো দিদি অধীর প্রতীক্ষায়—সুষমা হেসে বলে প্রভাতে উঠিয়ে ও মুখ দেখিনু দিন যাবে আজি ভাল।

—ও বাবা এ যে সুরেলা মাল দেখছি—দিদি নয় গো ভাই, কাঁধে কাঁধে যে সেম্ সেম্।

—তা হ'লে তোমার কথাও থাক, আমার কথাও থাক, তোমায় ভাইদি বলি কেমন? আমি সুষমা।

অঞ্জলি হাসে

—তা ভাইদি, তোমারটিকে চেনাও?

—এই তো সামনেই বাবু চোখ বুজে সিগ্রেট ফুঁকছেন—ওগো শুনছো—এই আমার সেই ডকটর লাভার—আর ওটি ওনার শক্তি—শক্তি হলেও নামটা কিন্তু সুষমা—ভারী মিষ্টি নাম। তাই না?

—ছাখো তো কটাক্ষী কিনা—তা হ'লে ওকে সুষি হতেই হবে। একদা ঐ কটাক্ষীই—থাক সে পুরোনো কথা—নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলে, তা বেশ, তা বেশ—শিবটিও তো উপযুক্তই হয়েছে দেখছি। বিশিষ্টয়া বিশিষ্টেন—সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ। ভগবান তো বুদ্ধিমান—নইলে এত বড বিশ্ব চালাচ্ছেন কি ক'রে? নলকে ঠিক দময়ন্তী জুটিয়ে দিলেন তো।

—সে আবার কি? অঞ্জলি বলে।

—তার মানে? শিবেনের জিজ্ঞাসা।

—নাঃ—ও এমনি কথার কথা—একটা নিলেনও যেমন একটা দিলেনও তেমনি।

—তবু?

—কলেজ রিইউনিয়নের শেষ বছরে আমি ছিলুম ওনার হিরো আর উনি ছিলেন আমার হিরোয়িন—মানময়ী গার্লস্ স্কুলে—বিশ্বাস না হয়, ভজিয়ে নাও—সে কি আজকের কথা গো—লং তিরিশটা বছর ঘুরে গেছে—

সুষমা হেসে সমর্থন করে—বলে, বাবু যে এতক্ষণ বঁদ হয়ে বসে ছিলেন, চিনতেই পারিনি আমার অমন ভূতপূর্ব হিরোকে। বদলেছে খানিকটা, তবে চোখের কাছে কাটা দাগটা এখনও প্রমিনেন্ট।

—ওল্ড ইজ অলওয়েজ গোল্ড, তাই না? একটা ধোঁয়া খান ডক্ দাদা—নিন ধরুন—বলে সিগারেটের প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিলে।

লুফে নিয়ে শিবেন বলে, তোমার জেঠু তাহ'লে অবশেষে গেলেন অঞ্জু?

—গেছেন আজকে? থার্টি ইয়ার্স এগো—আমার বিয়ের এক মাস পরেই। ফার্স্ট স্ট্রোকেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়াতেই তো আমার বিয়ের জন্যে অত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন। জানো তো সব।

—জানি আমি—গেছেন ভালই—উপযুক্ত বৃদ্ধ বয়সেই গেছেন—দুঃখু করার

কিছু নেই—চির স্থির করে নিয় ? তবে কি জান ? সেই তো গেলেন—একটু বুঝেসুজে কিছুটা এগিয়ে পেছিয়ে গেলেই,—

—মানে ?

—মানে আর কি ? একটু এগিয়ে যদি যেতেন তাহ'লেও তো কিছু বলবার ছিল না—পাত্র তো ফিপ্থ্ ইয়ার পর্যন্ত এক চান্সেই বেরোলো—আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিল—ঠাকুমাও তো নাতবৌ দেখবো নাতবৌ দেখবো ক'রে নাতবৌ না দেখেই চোখ বুজলেন। আর একটু পেছিয়েও যদি জেঠু যেতেন—তখন তো পাত্র ফুল ফ্লেজেড ডাক্তার—বাধা কোথায় ?

—তা তুমিই বা পর পর দুবার ফেল হলে কেন ?

—তখনকার আমলে ফাইনালে সার্জারীতে বা মিড ওয়াইফরীতে দু-একবার সাহেবের কাছে ঘুরে আসেনি এমন ভাগ্যবান খুবই কম ছিল। সাহেবের প্রথম প্রশ্নই ছিল—এটা কি তোমার ফার্স্ট চান্স ?

—ও তাই বুঝি এখন গাইনো সার্জেন হয়ে নিজের এলেম দেখাচ্ছো চুটিয়ে—নামও হয়েছে—পসারও বেশ জমেছে—কেষ্টবিষ্টুদের মধ্যে একজন। খুব তো লুঠছো।

—ভিতটা পাকা হয়ে গেল তো তবু—বিফলতার কল্যাণে। বাট্ হোয়াট ইজ লটেড্ ক্যান নট বি ব্লটেড্ বুঝেছো ?

—ভাগ্যং ফলতি কেমন ক'রে আমার কেসটা বলি—প্রেমাংশু বলে, সুষিতে আমাতে পাকাপাকি বোঝাপড়া একটা হয়েই ছিল। সুষিও জানতো আমিও জানতুম—দিল্লীতে ইণ্টারভিউ দিতে গেলুম, উৎরেও গেলুম—স্টার্টিংই সাড়ে ন'শোতে—তখনকার দিনে সাড়ে ন'শো—মাংস তখন দেড় টাকা দু টাকা সের—

অঞ্জলি বলে, কিসের মাংস ?

—হ্যাঁ গো বাবু—যা ভাবছো তা নয়—একেবারে কচি পাঁঠার। দোকানদার প্রমাণ দেখিয়ে দিতো।

—জানি না অবিশ্যি—তা বোধ হয় পাঁঠার দাম এখনও কম সুষি হেসে বলে উঠলো।

ডাক্তার বলে, সে দ্বিপদ—চতুষ্পদ নয়।

—থাক্ গে ও সব বাজে কথা—যা বলছিলুম—দেড়মাস পরে জয়েনিং ডেট। মাথায় তো একেবারে বজ্রাঘাত! ফিরে এসে শুনি—সুষির পিসি ফ্যাচাং তুলেছেন আমার নাকি রাক্ষসগণ আর ওদের মেয়ের নরগণ, আমার হাতে পড়লে আমি

নাকি ওকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবো, রাশিচক্র বিচারের ফলাফলে তাই জানা গেছে। ভাগ্যিস তখন সাহেব তুবার ফেরত পাঠিয়েছিলেন ভক্দাদাকে আর নেহাৎ অঞ্জলিকে ডাক্তারীতে ফেল-করা ছেলের হাতে দেবেন না বলে জেঠু জিদ ধরলেন, তাই তো এনার পাণিপীড়ন করবার অধিকার হ'ল। অঞ্জলির দিকে দেখিয়ে বলে, নয়তো চরম কেলেঙ্কারী হতো। দিল্লীতে ওদিকে বলে এসেছি—ফ্যামিলি নিয়ে এসে চাকরিতে জয়েন করবো।

—আরে, আমার কেসটাও তো সিমিলার—বলে সিগারেটের প্যাকেট ছুঁড়ে ফেরৎ দিয়ে ডাক্তার বলে, নেহাৎ ফর্চুনেটলি নরগণ হ'য়ে জন্মেছিলুম আর নেহাৎই আপনি রাক্ষস ছিলেন দাদা, তাই তো নরকুলের এই নারীটিকে কবলিত করতে পারলুম। থ্যাংক্স্ টু সুষীস্ পিসি আর থ্যাংক্স্ টু আমাদের রাশি।

অঞ্জলি বলে উঠলো, মানময়ী গার্লসটা কিন্তু চাপা পড়ে গেল—শোনা হ'ল না—আমরা উদগ্রীব দুজনেই কি বল? বলে ডাক্তারের দিকে চেয়ে থাকে।

—নিশ্চয়ই, যেখানে—"আমার উনিটি আন্ ঘরে ছিল আমারই দোরের পাশে" —সেটা শুনবো না! ডাক্তার বলে।

—মানময়ীটা আর একবার করলে হয় না? প্রেমাংশু সুষমার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে থাকে।

—আপত্তি কি? তবে কিনা এ বুড়োবুড়ীর অভিনয় এখন দেখবে কে?

অন্তত আর একটা বুড়ো ও আর একটা বুড়ীও তো দেখবে—আর কেউ দেখুক বা না দেখুক ছাই?

অঞ্জলি বলে, আমি খুবই রাজী—নিশ্চয়ই দেখবো, মেডেল দেবো।

শিবেন বলে, আই এগ্রি—এখনও অন্ধকার হলে বক্সে পাশাপাশি বসে দুই বুড়োবুড়ী—দেখতে ইচ্ছে করে না কি? রোজ রোজ দেখবো।

প্রায় এক ঘণ্টা জিরোনের পরে দুদিকের ট্রেনই দুলে উঠলো। এদিকেরটায় এতক্ষণে ইঞ্জিন বদল হয়ে গেছে আর ওদিকেরটায় এতক্ষণে লাইন ক্লিয়ার পেয়েছে।

দুদিকের ইঞ্জিনের বাঁশির যুক্ত শব্দে দু দলের কলধ্বনি চাপা পড়ে গেল। মনে হ'ল দু দলের হাত নাড়াটাকেও যেন কেউ বলিষ্ঠ দু হাতে দুদিকে জোর ক'রে খুব তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিতে লাগলো। কেন না, বর্তমানে নিজ নিজ শান্তির সংসারে ওরূপ আলোচনাতে আলোটা খুব কমই থাকে, চোনার অ্যাকসান্টাই বেশী জোরালো হয়।

প্রতি রবিবারে চতুষ্পদের আড্ডা।

কাছেই শক্তিপদর বাড়িতে তাস পিটতে যাই। গেরস্তর হাট বাজার কেনা কাটা সামলে সকাল ন'টা সাড়ে ন'টা নাগাদ যাই আর রাত্রি ন'টা সাড়ে ন'টা নাগাদ ফিরি। শক্তিপদ, বিষ্ণুপদ, হরিপদ ও আমি শ্যামাপদ—এই চতুষ্পদের আড্ডা। এক নাগাড়ে বারো ঘণ্টা, মধ্যে কেবল আধঘণ্টার ইণ্টারভাল।

সে রবিবারে তাসের আসরে এক অন্ধ ভিখারী শক্তির বাড়িতে গান গাইতে এল—দে মা আমায় পাগল ক'রে। অত সুন্দর গলা আমরা কেউই বড় একটা শুনতে পাই না। যেমন মিষ্টি গলা তেমনি গলার কাজ। প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

শক্তি হাঁকল, ওরে কে আছিস্ ওপরে, দুটো পয়সা ফেলে দে—মটরা বাঁটলো তিনু কে আছিস রে ওপরে ?

বিষ্ণুপদ থেমে বলে, আরে গানটা হ'তে দে না। গাও হে তুমি, গেয়ে যাও—বেড়ে গাইছ তো ?

হরিপদ বলে, লোকটাকে আমি চিনি। সত্যিই হতভাগা আশ্রয় সহায় সম্বল কোথাও কিসসু নেই—আছে শুধু গলাটা আর ঐ দুটো খঞ্জনী। বদ্ধ পাগল একটা। ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরম্।

আমি বললাম, ভগবান একটা নিয়ে একটা দেন। চোখটা নিলেন, গলাটা দিলেন।

পরের রবিবারে আড্ডায় প্রায় ঠিক ঐ সময়ে ভিখারীটি আবার এসে গান ধরে—

এ পৃথিবীতে কেউ ভাল তো বাসে না,
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না।

আমি বলি, স্প্লেনডিড্।

শক্তি বলে, মারভেলাস্।

হরি বলে, জিনিয়াস্।

বিষ্ণু বলে, ইউনিক্।

পরের রবিবারে আর সে আসেনি—খেলার মাঝে তার অভাব বিলক্ষণ

বোধ করলাম।

বিষ্ণু বলে, তাই খেলা জমছে না।

হরি বলে, সেকেণ্ড দিনে কি গাইলে যেন?

শক্তি বলে, প্রথম দিনে গাইলে—দে মা আমায় পাগল করে—দ্বিতীয় দিনে গাইলে—এ পৃথিবীতে কেউ ভাল তো বাসে না—

আমি রসিকতা করে বলি, বোধ হয় এবারে সাধও মিটেছে আশাও পূরেছে—তাই এলো না।

সকলে নির্বোধের মতন হেসে উঠল।

পরক্ষণেই আমাদের হাসি স্তব্ধ হয়ে গেল।

শক্তিপদর ছোট ছেলে এক গ্লাস জল দিতে এসে জানালো, অন্ধটি আজ দু-তিনদিন হল রাস্তায় গুলি খেয়ে মারা গেছে।

শক্তি বলে, কার গুলিতে?

হরি বলে, গুলিতে না ছুরিতে? বোমা লেগে নয় তো?

বিষ্ণু বলে, মাস্তানদের না পুলিসের? কোনো পার্টির না গুণ্ডা এলিমেন্ট?

আমি বলি, যাই হোক, মানে তো একই।

এ পৃথিবীতে কেউ ভাল তো বাসে না
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

আমার নাতনীর বিদ্যের দৌড় বলি—

সে যুক্তাক্ষর পেলে সব সময়ে গুছিয়ে বলতে পারে না—হয় বলে চট্টগ্রাম অস্ত্রগ্রাম লুণ্ঠন না হয় তো বলে চট্টাগার অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

অনুচ্চস্বরে সেদিনের খবরের কাগজ পড়ে বললাম ছোঁমারু বোমারু বিমানটি খুব নিকটবর্তী এসে পড়লে তাকে গুলী করা হয়। খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পালাবার চেষ্টা করে বটে কিন্তু পরক্ষণেই খুব তৎপরতার সঙ্গে আমাদের স্থলবাহিনী পুনরায় গুলীবিদ্ধ করে ছোঁমারা বোমারা বিমানটিকে অবশেষে ভূপাতিত করে।

নাতনী পাশেই ছিল—বলল, দুটোই ভুল পড়া হল যে—কথাটা তো হবে ছোঁমারা বোমারু বিমান।

বললাম, ও, তাই বুঝি? তবে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হ'তে বাধা কি?

পরের দিন হ'তে সে আর ভুল করেনি।

কিছুদিন পরের কথা।

নাতনী একটু বড় হয়েছে—আমি একটু বুড়ো হয়েছি। সেদিন ছুটির দিনে সকালে মক্কেল নিয়ে বসেছি। কান্তবাবুকে বলি—মামলা তো জিতবোই কিন্তু কথা হচ্ছে ডিক্রীর টাকাটা আদায় হবে কিনা—বাবুর চালচুলো কিছু আছে না ভুয়ো?

কথার মাঝখানে শান্তবাবু হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকেন; বলেন, আমার ডিফেন্সটা কি হবে কিছু ঠিক করলেন স্যার?

বলি, রোখবার তো কিছু নেই—হুণ্ডি কেটেছো—স্বীকার করেছো অর্ডার থার্টি সেভেনএর স্যুট—সিকিউরিটি দিতে পারবে না। দাঁড়িয়ে হারবোই—যে কদিন টালবাহানা করে চলে।

ওরা চলে গেলে নাতনী বলে, তোমার মামলা তুমিই বুঝি শুনবে?

বলি, দূর পাগলী, শুনবে জজসাহেব—আমার ওপর বোঝাবার বোঝা; জেতা হারা তাঁরই হাতে।

তা হ'লে কান্তবাবু শান্তবাবুকে যে ওকথা বললে?

কিছুটা থতিয়ে যাই—জবাব যোগায় না।

পরের দিন হতে আমি মক্কেলদের বলি—আপনার ম্যাটারটা ভাই বর্ডার লাইন কেস; দেখি কি করতে পারি।

রাত্রি দশটা বেজে গেছে—

ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম—ছোট মেয়ে বলল, বাপি, ঘুমুচ্ছো যে, পশুর গান হবে শুনবে না ?

সঙ্গে সঙ্গেই শুনলাম রাস্তার মোড়ে প্যাণ্ডেল থেকে সজোরে অ্যানাউন্সার বলছেন, এইবার এই পল্লীর জনপ্রিয় গায়ক সুধাকণ্ঠ শ্রীপশুপতিনাথ নাথ মহাশয় একখানি গান গেয়ে আপনাদের শোনাচ্ছেন।

মেয়েকে খুবই বকলাম, পশু কি ? পশুপতিবাবু বলতে হয় জান না ?

উদাত্ত ভরাট কণ্ঠে দরদী গায়ক দরাজ ভাবে গাইলেন—

মা পাওয়া কি সহজ কথা
তারা তো নয় পথের ধূলো
রয় না পড়ে যেথা সেথা

নিস্তব্ধ ও নিথর আবহাওয়ায় নির্বাক ও নিস্পন্দ শ্রোতৃমণ্ডলী সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন গানটি ও গায়ককে গিলতে লাগলেন।

ঘুমের আমেজেই মনে মনে বলেছিলাম, আহা, কণ্ঠে খেলছে সাতটি সুর—সাতটি যেন পোষা পাখি।

তার পরের ঘটনা জানি না—বোধ হয় ঐ গানের পরেই সেদিন আসর ভঙ্গ হয়।

হঠাৎ পাশের বাড়ির একতলার ঘরের দরজায় সজোরে পদাঘাতের শব্দে ঘুমের আমেজ টুটে গেল।

বৃদ্ধা অনর্গল কাশতে কাশতে বললেন, কে রে, খোকা এলি ?

জড়িত স্বরে শুনি, না, খোকা আসবে কেন, তোর যম এলো যে—এত লোকের মা মরে রে আমার পোড়া মা আর মরে না। নবাবনন্দিনীর নিত্যি রোগ আর সদাসর্বদা ঘুম—ন্যাকামীরও শেষ নেই ; গিলুনীরও কামাই নেই—বলিহারী বাওয়া !

মেয়ে বলল, বাপি ? পশুপতিবাবুর কথা শুনলে ?

বললাম, পশুপতিবাবু না হাতি, বেটার ছেলে নামেও পশু কাজেও পশু। নিত্য নেশাভাং করবে আর জ্বালাবে। একটি চড়ে মুখ ভেঙে দিতে ইচ্ছে করে, আর বাক্যস্ফূর্তি যাতে না হয়।

ও বাড়িতে রেডিয়োয় গান হচ্ছিল—

কিঞ্চিৎ জোরেই হচ্ছিল বলব ; এ বাড়িতে দু'টি ছেলে নিচের ঘরে পাশের পড়া পড়ছিল—পরীক্ষা আগতপ্রায়।

সুরেন বলে, কি গাইছে বল্ দিকিনি ?

বিশ্বনাথ অনেকক্ষণ শুনে মাথা নেড়ে বলে, খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে ধরতে পারছি না ভাই—খুব জমাটি—মাত ক'রে দেয় কি যে ব'লে ওটাকে ভুলে যাচ্ছি—বল্ না ?

সুরেন বলে, বুঝেছি তুই কি দরের সঙ্গীত-বিশারদ ! আরে ছ্যা—মুখেই খালি অমুক খাঁ তমুক বাই—একটা সিম্পল্ মালকোষ ধরতে পারলি না—বোকা কোথাকার—ইডিয়ট।

বিশ্বনাথ বলে, দি মালকোষ মাইরি—বললুম তো ধরতে পাচ্ছি বলতে পাচ্ছি না—তুই তো খুব থরো স্টাডি করেছিস—পারফেকট্ সুরজ্ঞান হয়েছে মানতে হবে।

সুরেন ঈষৎ হাসল—যেন কথাটা মিথ্যা নয়।

কিন্তু ভিতরকার কথা বলতে গেলে বলতে হয় সঙ্গীত ব্যাপারে দুজনেই সমান অজ্ঞ। রেডিয়োতে যখন বলছিল—'এখন সুরসাগর দলুবাবু শ্রীসুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনাদের একখানি মালকোষ গেয়ে শোনাচ্ছেন' তখন বিশ্বনাথ সুরেনকে বোঝাচ্ছিল যে 'একটা সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপরে অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র উহার অপর দুইটি বাহুর উপরে অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান'—এবং সেইজন্যই বিশ্বনাথ রেডিয়োতে কিঞ্চিৎ অমনোযোগী ছিল এবং সুরেন নিঃশব্দে বুঝছিল বলে আঁকের চেয়েও রেডিয়োতে কিঞ্চিৎ মনযোগী ছিল।

পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে।

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে কাগজ কিনতে গিয়েছিলাম। আধপাগলা একটি ছেলে এগিয়ে এসে বলে, আমার কাছে নিন স্যার—হেল্প্ মি প্লিজ—

নিলামও তাই—সামনের পাতায় দেখি আমার ছেলের নাম লাল পেন্সিলে মোটা ক'রে দাগ দেওয়া—তৃতীয় স্থানের অধিকারী হিসাবে সমস্ত নামটার তলায় লাল দাগ টানা—কমলকুমার রায়।

জিজ্ঞাসু নেত্রে বিক্রেতার দিকে দেখলাম—একি, দাগ দেওয়া কেন?

ছেলেটি বলল, কমলকুমার রায় আপনি? মানে আপনার ছেলে? থার্ড হয়েছে—আমিই দাগ দিয়েছি—আমিও কমলকুমার কিনা—কমলকুমার দাস। জানেন? গতবারে কমল নাইন্থ্ হয়েছিল—সে ছিল কমলকিশোর ক্ষেত্রী। তার আগের বারে কমল টেন্থ্ হয়েছিল—তার নাম কমলকিঙ্কর বিশ্বাস। জানেন? প্রত্যেক বারেই কালীঘাটে গিয়ে মাকে ডেকে বলেছি এবারের চেয়ে আসছে বারে যেন আমার আরও উপর দিকে নাম থাকে। আমায় তো পরীক্ষা দিতে দিলে না মা, আমার নামটা কিন্তু প্রতিবারেই প্রথম পাতায় ছেপো—ঠিক মনে রেখো, ভুলো না যেন। দুটি পায়ে পড়ি তোমার মা।

বাক্শক্তিবিরহিত হয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পাশে বয়স্থ একজন হকার বললেন, যেতে দ্যান্ বাবু। কেন পাগলাটার কথা খামোকা শোনেন? টাকার চেঞ্জ পেয়েছেন তো? এই কম্লা—কেন সব যা-তা বকিস বাবুদের সাথে?

আমি কিন্তু তৃপ্ত হলাম না—বললাম, ব্যাপার কি? যা শুনলাম—ছেলেটি কমলকুমার দাস বৃত্তি পরীক্ষায় ডবল বৃত্তি পাওয়া ছেলে। টেস্ট পরীক্ষার ঠিক আগে হঠাৎ মারাত্মক টায়ফয়েড্ হয়। বিয়াল্লিশ দিন যমে-মানুষে টানাটানির পরে যদিও মানুষ জিতল তবু যমের থাবার দাগ ছেলেটিতে অক্ষয় হয়ে রয়ে গেল। সেই থেকে কমল বেঁচেও মরে থাকার সামিল হয়ে আছে।

আমার এত আনন্দের দিনেও জলে দু চোখ ভরে গেল।

ভদ্রলোককে দেখি নি, চিনি না।

কিন্তু সেদিন দেখলাম ও চিনলাম এমন ভাবেই যে কোনদিন ভুলব না।

দুজনে পাশাপাশি বসে শো দেখছি—দুজনই নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি—আমাকে কার্ড দিয়েছেন পরিচালক মণ্ডলী আর ভদ্রলোককে কার্ড দিয়েছেন তাঁর এক ভাই—মিস্টার খাস্তগীর প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী যিনি নাকি ঐ গ্যাদারিংয়ে নাচ দেখাবেন।

প্রারম্ভিক গৌরচন্দ্রিকা সারার পরে শো শুরু হল প্রায় তখন সাড়ে সাতটায়।

অ্যানাউন্‌সার জানালেন এইবার কুমারী উপমা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথমে একখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আপনাদের শোনাচ্ছেন।

নিয়মমাফিক হলের আলো নিভল—স্টেজের আলো বাড়ল—জনগুঞ্জন থেমে এলো। তবলায় দু-একটি মৃদু ঠেকা পড়ল এবং সবশেষে গান শুরু হল।

গান শুরু হল বটে—খানিকটা চললও বটে কিন্তু জমল না—রবীন্দ্র-সঙ্গীত—'আরো আরো প্রভু আরো আরো।'

আমি নিজে গান জানি—আমার হিসাবে গান যে জমে নি তা গায়িকা বালিকার দোষে নয়—ফাংসানের মুখপাত বলে যে রকম গান বর্তমান শ্রোতারা আশা করেন—তদনুযায়ী হয়নি।

অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় বালিকাকে তাড়াতাড়িই গান শেষ করতে হল।

গানের শেষে পাশের ভদ্রলোকটি রসিকতা করে বললেন, গানটা কেমন দেখলেন স্যার?

গা জ্বলে গেল। কথাটি শুনতে পাইনি এরূপ ভাব দেখালাম।

অনেকগুলি আইটেমের পরে অ্যানাউন্‌সার ঘোষণা করলেন এবারে মিস্টার খাস্তগীর আপনাদের কিউ নৃত্য দেখাবেন—ভীড়ের মধ্যে কিউয়ে দাঁড়িয়ে লোকের মনের ভাব কি রকম হয়, আশেপাশের লোক উঁকি-ঝুঁকি মেরে কিউএ ঢুকে পড়লে কি অবস্থা হয় এবং সর্বশেষে কয়েক ঘণ্টা কিউএ দাঁড়িয়ে থেকেও ঈপ্সিত জিনিস না পেলে মনের কি অবস্থা হয়—তার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি শিল্পী নৃত্যের মাধ্যমে কিরূপ ভাবে ফুটিয়ে তুলবেন আপনারা দেখুন। ব্যাকগ্রাউণ্ড

মিউজিক দিচ্ছেন—সানাই সমিতি।

পাশের ভদ্রলোকটি পুনরায় মনে করিয়ে দিলেন এই মিস্টার খাস্তগীরই তাঁর ভাই—আপন সহোদর ভাই ও প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী—পুনশ্চ বললেন কি অপরূপ যে নৃত্য দেখাবেন তা বলে শেষ করা যায় না।

হলের আলো পুনরায় নিভে গেল, স্টেজের আলো পুনরায় বাড়ল—জনতার চিৎকার ধ্বনি ক্রমান্বয়ে শোনা গেল—ফকাস্—ফকাস্ প্লিজ্

সানাই সমিতির ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক সত্যিই অপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব—প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

তবে নৃত্যের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝলাম না। দৈত্যপ্রমাণ বিরাটকায় লোমবহুল এক ব্যক্তি স্টেজের উপর প্রায় পনেরো মিনিট কি আরও বেশী সময়ই হবে প্রচণ্ড বিক্রমে দাপাদাপি করে মূকবধির ভাবে কি যে বোঝাতে চাইলেন—আমি তো বুঝলামই না বটে—কেউই বড় একটা বুঝল না—তার প্রমাণ নৃত্য চলাকালীন গুঞ্জনরব বৃদ্ধি পাচ্ছিল—বিরক্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হল এবং কলকাকলী অনেকটা উচ্চ পর্দায় উঠতেই পরিচালক মণ্ডলী জিনিসটাকে সর্টকাট করতে চাইলেন। উইংসের আড়ালে তাঁকে স্টেজ থেকে ডেকে নেওয়া হ'ল।

অবশেষে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে মিস্টার খাস্তগীর যখন পালালেন তখন বুঝলাম নাচ দেখানো তাঁর হয়ে গেছে। আরও বুঝতে পারলাম কারণ ড্রপসিন ততক্ষণে পড়ে গেছে—ঘরের আলো জ্বলে উঠেছে। হাততালির বহরটা খুবই স্তিমিত।

পানের বাক্স খুলে ভদ্রলোকের সামনে ধরলাম; বললাম, নাচটা কি রকম শুনলেন স্যার?

ভদ্রলোক কোন বাক্যব্যয় না করে উঠে গেলেন।

ছুটির দিনে সকাল বেলা—

· অমলকে ইংরাজীর খাতা ফেরত দিতে গিয়েছিলাম। রাস্তার মোড়েই অমলের বাবার সঙ্গে দেখা—বিনীত ভাবে নমস্কার করে ঈষৎ হেসে জিজ্ঞাসা করি, অমল আছে ?

উত্তর—হ্যাঁ, খোকা তো ? দেখলুম যেন বাড়িতে আছে।

বাড়িতে এসে অনুচ্চস্বরে ডাকি, অমল অমল !

সদর দরজা হাট করে খোলাই ছিল, উপরন্তু বাড়িও জনশূন্য ছিল না।

খানিকক্ষণ পরে পাশের ঘর থেকে অমলের মা বললেন, বঙ্কু কোথায় গেলি রে ? ত্থাখ্ তো বাইরে কে অনেকক্ষণ ধরে অমলকে ডাকছে—ওপরে থাকে তো ডেকে দে, না হয় তো বলে দে বাড়ি নেই।

বঙ্কু একটুও নড়ল না বা কিছুই দেখল না। চোখ বুজে এক বাটি মুড়ি চিবুতে লাগল। পাশে শালপাতায় রাখা আধখানা পিঁয়াজ ও দেড়টা লঙ্কা।

আরও খানিকটা বাদে অমলের ঠিক পরের ভাই শ্যামলকে বেরিয়ে যেতে দেখি। 'কি খবর, অমলকে নাকি ?' আমাকে বিগলিত করে দিয়ে চলে গেল—প্রত্যুত্তর শুনবার তার সময় নেই।

ফিরে আসছি, দেখি অমলদের পুরনো চাকর রেশন বয়ে আনছে—আরও খানিকটা পিছনে অমলের বড়দাদা বিমলবাবু।

চাকরকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করি, অমলবাবু হ্যায় ?

খৈনির পিক ফেলে সে জবাব দিল, কেয়া জাননে গিয়া, হোনে সেক্তা মালুম হোতা—জেরা ঠারিয়ে।

আমার প্রশ্ন বোধ হয় বিমলবাবু শুনেছিলেন—বললেন, অমল বোধ হয় নেই—সকালে তার একবার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা ছিল—সেখান থেকে যাবে উল কিনতে—এলে কিছু বলতে হবে ?

আর ঠারিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল না—ফিরছিলাম—দেখি, অমলের ছোট ভাই কমল ওরফে মণ্টু ওপাশের বাড়ির রকে বসে নিবিষ্ট চিত্তে আমের আঁটি চুষছে। নাকের শ্লেষ্মায় ও ফলের রসে ওপর ঠোঁটের বহির্ভাগ জবজবে হয়ে

উঠেছে—দেখলুম।

পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, অমল আছে?

আমের আঁটির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে বলে, কে, মেদ্দা ভাই?

যেন অকূলে কূল পেলাম—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার মেজদাভাই—একবার ডেকে দাও তো, লক্ষ্মীটি।

এক মিনিট দু মিনিট তিন মিনিট চার মিনিট পাঁচ মিনিট কেটে গেল, মণ্টুর কোন প্রকার ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না। আমের আঁটিটি ততক্ষণে সাদা হয়ে গেছে।

আবার বলি, কি গো, ত্যাখো একবার—অমল আছে?

নিকটে গ্যাসপোস্টে একটি কাক বসেছিল। আঁটিটি তার দিকে তাক করে ছুঁড়লে গ্যাসপোস্টে ঠোক্কর খেয়ে সামনের বাড়ির জানলা দিয়ে আঁটিটি ঘরের ভিতর তির্যক ভাবে চলে গেলে পরক্ষণেই বামাকণ্ঠে শুনি—কে রে? কোন্ হতভাগা সাত সকালে ঘরদোর নোংরা করলে? এই মাত্তর ধুয়েপুঁছে যাচ্ছি।

ঘটনাস্থলে আর থাকা শ্রেয় নয় বুঝে মণ্টু হাত চাটতে চাটতে প্রশান্ত ভাবেই চলে গেল। আমায় খালি বলে গেল—মেদ্দা ভাই? জানি না তো।

ট্রাম স্টপেজে দেখা হল—

গদাধরবাবু কোমরে হাত দিয়ে বীরদর্পে সিগারেট টানছিলেন। বললেন, কি মশয়? শরীল্ কেমুন্?

নমস্কারান্তে বলি, কই, আপনার গল্পটল্প তো আর দেখি না?

ঈষৎ হেসে উত্তর হল, এহনে আর লিহিটিহি না।

এখন আর লেখেনটেখেন না, কেন? বেশ তো লিখতেন?

ওসব লেহাটেহা পোলাপানদের শোভা পায়। বড় হ্ওনের পথে অন্তরায়—একটা বিরাট বাধা। অত সময় কুথা? ক'ন্?

বলি, তবে—?

বলেন, দ্যাখেন না বর্তমান পরিস্থিতি? দ্যাশে কত শত সমস্যা। বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচারের মধ্যি দ্যাশবাসীর চ্যাতোনা উদ্বুদ্ধ করা যার যতটুকুন সাধ্যি করা চাই। লেহা পড়ে কেডা? আর দ্যাখেন না সভাসমিতিতে কি বিপুল জনাধিক্য? পেপারে ছবি দ্যাখেন না, কালো কালো মাথার কি মহাসাগর?

বলি, তা যা বলেছেন—যাবতীয় সমস্যা সমাধানের একটা শাশ্বত প্রচেষ্টা।

গদাধরবাবু বলেন, তবে? ধরেন বাঁচোনের খাওনের থাকোনের পরোনের যায়োনের সমস্যার স্পেস্ কুথা? না কি ক'ন তো—দেহি। সমাধান তো একটিই; নিরোধ।

বলি, তা যা বলেছেন—পলিটিক্স্ করেন তো—আপনার পার্টি কি?

ওসব পার্টিফার্টি ছাড়ান দ্যান্—সদাসর্বদা বিরোধী দল—অপোজিসন্ পার্টি—তা যে সরকারই হউক না কেন?

বলি, তা এতে ধরপাকড় গ্রেপ্তার কারাবরণ—এসব তো?

গদাধরবাবু বলেন, আছে না? ওসব এখন আমাগোর অঙ্গের ভূষণ। তবে কিছুটা ব্যাস কম্—সিজন্ বুঝে এই তো দুই দিন হ'ল ছাড়া পাইছি।

মনে পড়ল—ঠিকই তো—এই গত রবিবারই দুপুর বেলায় কাগজে পড়েছি—গত মাসে হাওড়া স্টেশনে জনৈকা বিবাহিতা মহিলার গলার হার ছিনিয়ে নেবার অভিযোগে পুলিস গদাধর প্রামাণিক প্রমুখ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে—পরে ম্যাজিস্ট্রেট যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে গদাধর ও বাবলু ওরফে রমজানকে মুক্তি দেন—আসামীরা এযাবৎকাল পুলিস হাজতেই ছিল।

রক্তাল্পতায় ভুগিতেছিলাম।

শলাপরামর্শ তাগা তাবিজ টোটকা টুটকী গাছগাছড়া ঝাঁড় ফুঁক সব কিছুই যখন বৃথা হ'ল তখন হোপলেশ হয়েই অধর ডাক্তারের কাছে গিয়ে সবিশেষ বললাম। মনের ভাবটা অনেকটা-তুঁহু মম শ্যাম সমান—গোছের।

শুনে দেখে পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবুর প্রশ্ন হ'ল, কি হয়?

বলি, হবে কি ছাই? হয়েছে—খুব দুর্বল, রক্তাল্পতা হয়েছে—অ্যানিমিক্ ভাব বেড়েই চলেছে—পেটে খিদে নেই, চোখে ঘুম নেই, দেহে বল নেই, মনে সুখ নেই।

ডাক্তারবাবু বললেন, হুঁ,—ভিটামিন বি-এর অভাব। এই একটা ওষুধ দিচ্ছি, রোজ খাবার পরে একটা ক'রে ক্যাপসুল, দু বেলায় দুটো, আর একদিন অন্তর একটা করে ইনজেকনস্ নিন—বলে প্রেসক্রিপশনটা আমায় দিলেন। বাঁড়ুয্যে কি বলেছে? রক্তাল্পতা? অ্যানিমিয়া?

বলি, বাঁড়ুয্যে কে?

কেন—অনিমেষ ব্যানার্জি—বললেন যে? ক্যাপ্টেন্ ব্যানার্জি?

না, তা তো আমি বলিনি—আমি বলেছি অ্যানিমিয়া বেড়েই চলেছে—

ও, বুঝেছি—আচ্ছা নমস্কার, আসুন, আমার এখানে ষোল টাকা ফী।

চলে আসছি—কি মনে হল, পুনরায় বলি, ভিটামিন বি থেকে শুরু করলেন স্যার, এক্স্ ওয়াই জেড পর্যন্ত চালাবেন নাকি? তবেই সেরেছে।

ডাক্তারবাবু ততক্ষণে পরের রুগীতে মন দিয়েছেন। বললেন, তর্ক করবেন না। রুগী, রুগীর মতন থাকুন। পনেরো দিন পরে মনে হয় সেরে যাবে।'

পনেরো দিনের পরিবর্তে বিশ দিন কেটে গেল—আমার রোগ কিন্তু বিশ থেকে উনিশে নামেনি। ভুগে ভুগে একটু খিটখিটে হয়েছি।

বিশ দিন পরে ডাক্তারের সঙ্গে পুনরায় দেখা করলে তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, কি? আপনার তো সেই রক্তাল্পতার কেস? তাই না? তা এখন কেমন? বেটার?

অপ্রসন্নচিত্তে জবাব দিই, রক্তাল্পতা এখন বিরক্তাল্পতায় দাঁড়িয়েছে।

যেন আকাশ থেকে পড়ে ডাক্তারবাবু বললেন, সে আবার কি ?

বলি, রোগের পূর্বেকার লক্ষণগুলি সব ক'টি বজায় তো আছেই তার উপর একটা ফালতু উপসর্গ বি বেড়েছে—ভিটামিন বি-এর গুণে। মেজাজটা একটু খাট্টা হয়ে যাচ্ছে—সব কিছুতেই বিরক্তি আসে আমি সেটা বেশ বুঝতে পারি। রেডিয়োতে মিষ্টি গান হলেও খিঁচিয়ে উঠি। ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দেখলে ভাবি, গিন্নী এদের জুটবে কোত্থেকে ?

তবে তো ওষুধ ধরেছে—অ্যাকসন্ হয়েছে দেখছি।

মানে ?

বিরক্তির ভাব তো আপনার প্রথম দিনেও ছিল—সেটা তখন বুঝতে পারেননি—আমি যখন আপনাকে প্রথম প্রশ্ন করি, কি হয় ? আপনি তখনই উত্তর দিলেন—হবে কি ছাই ? হয়েছে ; তাই না ? মনে পড়ে ? এখন তো তবু বিরক্তিটা বুঝতে পারছেন।

আমি নিরুত্তর হয়ে থাকি—সত্য কথাই।

ঐ ক্যাপস্থলটাই চালিয়ে যান আরও দুটো ফাইল। ইনজেকসন বন্ধ থাক—ওতেই সারবে।

অপ্রসন্ন ভাবটা আমার সঙ্গে সঙ্গে বেশ খানিকটা হালকা হয়ে গেল, বুঝতে পারলুম যখন ডাক্তারবাবু বললেন—আজ আর ফী দিতে হবে না।

বেরিয়ে আসছি, ডাক্তারবাবু পুনরায় ডেকে বলেন—গোটা দুই ফাইল খাওয়ার পরে আর একবার দেখিয়ে যাবেন—টাকাকড়ি লাগবে না আর।

নিজের অজ্ঞাতসারে হেসে ফেলে বলি, আচ্ছা স্যার, নমস্কার।

ইদানীং কোনদিন হেসেছি বলে তো মনে পড়ে না। ওষুধটা বোধহয় ধরেছে, অ্যাকসনও মনে হয় আসতে আসতে হচ্ছে। নয় তো, শুধু শুধু হাসি এলোই বা কেন।

॥ ৪১ ॥

শ্রীলেখার বিবাহ সম্প্রতি হয়েছে—

সুলেখার বিবাহ সম্প্রতি হবে। কিছুটা অভিজ্ঞতার দাবীতে শ্রীলেখা বলে, ঘুর ঘুর করতে অনেককেই তো দেখ্‌লুম—ভাল ক'রে বাজিয়ে দেখতে হয় ঠুনকো কিনা—ঈষৎ ঠোক্কর লাগলেই ভেঙে যায় কিনা—মানে আস্‌লি না নক্‌লি।

সুলেখা জবাব দেয়, ফল্‌স্‌ জিনিসের আবার জেল্লা বেশী। সাচ্চা ঝুটা চেনা বড় শক্ত।

শ্রীলেখা বলে, কেন? এই ধর্‌ আমরা থাকতুম তখন শ্যামবাজারে, তোর যতীনদা এলো, বললুম যাও তো একবার লেক মার্কেটের সূর্য স্টোরস্‌ থেকে সানলাইট সাবান একটা কিনে আনো তো—বিল দেখিও বলতে পারি না খারাপ দেখায়—ঘুরিয়ে বলতুম ওদের লাকী কুপন চেয়ে নিও—ভুলো না যেন—সারা শহর ঘোরাতুম; দেখতুম টেম্পারের টেম্পারেচার নর্মাল থাকে, না ক্রমে ক্রমে বাড়ের দিকে যায়।

সুলেখা উল বুনতে বুনতে বলে, আমি রমেনকে কি বলি বল্‌ তো?

শ্রীলেখা বলে, তোর কেস্‌ তো আরও সোজা—রমেনকে তোর ঐ উল থেকে একটুখানি ছিঁড়ে রং মিলিয়ে উল আনতে বলে দে—তামাম কলকাতায় ঐ রংয়ের উল কোথাও পাবে না—কিছুতেই পেতে পারে না—তুই জেনে রাখিস—আমি বাজী রাখছি, কখনও পাবে না।

সুলেখা চেয়ে থাকে, বলে, কেন? নম্বর মিলিয়ে?

শ্রীলেখা জবাব দেয়, উলের আসল রংটা তোর হাতের ঘামে একটু তফাৎ হয়েই গেছে—ও রংয়ের উল রং মিলিয়ে নম্বর মিলিয়ে আনলেও তোর হাতের উলের সঙ্গে মিলবে না—মিলতে পারে না—আবার পাঠাবি—আবার আসবে—আবার মিলবে না—আবার পাঠাবি—।

তা হ'লে?

তখনই জানতে পারবি, তোর কথাতে রমেন চটেছে না পটেছে।

নিয়তি আপীলকারিণী, বিধাতা বিচারক।

রায় মৃত্যুদণ্ড। বললেন অপূর্ববাবু। পাকা ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার; প্রবীণ ঝানু উকীল।

সামনে সেদিনের খবরের কাগজ খোলা। লাল পেন্সিলে মোটা করে মার্জিনে দাগ দিয়ে রেখেছেন।

মৃতদেহ উদ্ধার—পুলিস চল্লিশ বছরের আন্দাজ এক ব্যক্তিকে আমহার্স্ট স্ট্রীট বৌবাজারের সংযোগস্থলের নিকটে মৃত অবস্থায় গত শনিবার ভোরের দিকে পেয়েছে। গায়ে বহু ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সে সম্ভবত অধিক রাতে বাড়ি ফিরছিল। তার কাছে আড়াইশো টাকা, হাতে হাতঘড়ি ও আংটি পাওয়া গেছে; কিছু খোয়া যায়নি। তার নাম পালান রায়। আততায়ী তাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে খুন করেছে বলে পুলিস সন্দেহ করছে। পুলিস আরও জানিয়েছে এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কোন রাজনৈতিক কারণ নেই। আততায়ী এখনও ধরা পড়েনি।

অপূর্ববাবুর দিকে চাইতেই তিনি বললেন, আততায়ী কোনদিন ধরা পড়বেও না। তবে সবটা বলি শোন—

প্রসিকিউসন কেস্ ভাল ভাবেই সাজানো হয়েছিল সেবারে—

যোগজীবন ও জগন্নাথকে মামাতো পিসতুতো ভাই বলেই লোকে জানে। আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চলে একটা ভাঙা বাড়ি দুজনে ভাগাভাগি করে ভাড়া নিয়ে থাকে।

জগন্নাথ আবার একটা পোরসন্ হারাধনকে সাবলেট করেছিল কিন্তু রসিদ দিত না।

যোগজীবন বুঝেও না বোঝার ভান করতো।

যোগজীবনের টাঁক ছিল হারাধনের মেয়ে কাজলটার ওপর।

ভাবে, মেয়েটাকে কোন রকমে ম্যানেজ করতে পারলে দমকা বেশ মোটা রকমের আমদানী হয়—বড়লোকের অভাব কলকাতায় তো নেই—দু দশ হাজার তাদের কাছে কিছুই নয়।

তার আগে ওটাকে কিন্তু বাড়ি থেকে সরাতে হয়—যে কোন ছলছুতোয় জগন্নাথকে সে বোঝাতে চায় হারাধন যেন আসছে মাস থেকে তাকেও কিছু কিছু দিতে থাকে—চারদিকে বড় টানাটানি, যা মাগ্যি গণ্ডার বাজার—আর তো চলে না।

হারাধন কিন্তু রাজী হয় না, বলে, বাড়ি সে ছেড়ে দেবে তা'হলে।

সময় মত পালানও এসে জুটলো—বড় পরোপকারী ছেলে—হারাধনের দুঃখে গলে যায় সে।

পাঁচ-সাতখানা বাড়ির পরে পালান একটা বাড়ি জুটিয়েও দেয় সঙ্গে সঙ্গে।

মাঠকোটার দোতলায় একখানা ঘর, কোলে সরু বারান্দা, ভাড়াও কম।

হারাধন ও কাজল পালানের মহানুভবতায় বোবা হয়ে যায়।

পরের রোববারেই হারাধন ও বাড়ি থেকে হাঁড়িকুড়ি ভেওঢাক্‌না সব নিয়ে এল নতুন বাসায়। কাজল আবার নতুন করে ঘর গোছালো।

যোগজীবন পাখাটাকে খুলতে দেয়নি সেদিন।

পরের দিন মিস্ত্রিকে নিয়ে হারাধন যখন গেল যোগজীবন অপমান করে ধাক্কা দিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেয়।

জগন্নাথকে যখন এতদিন ভাড়া দিয়ে এসেছে তখন যোগজীবনকেই বা দেবে না কেন? জগন্নাথকে দেওয়া টাকার টোটাল্ অঙ্কে নাকি শুধু বাপকেই কেনা যায় না—বেটীকেও কেনা যায়।

হারাধন ক্ষুব্ধ হয়ে পালানকে জানায়; কাজল পালানকে বলে একটা বিহিত করো—তাছাড়া যোগজীবনের হালফিল চালচলনটাও যেন কেমন কেমন ঠেকছে। আজ দুপুরেই একটা গিন্নিবান্নি গোছের লোককে পাঠিয়ে কাজলকে খবর দিয়েছিল —বাবা দোকানে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে—আমাকে দেখতে চাইছে—ভাগ্যিস বুদ্ধি করে যাইনি। হারাধন কাছেই একটা স্যাকরার দোকানে কাজ করতো।

পালান পরোপকারী ছেলে—জনহিতকর কাজ করাই তার পেশা। পালানের আসল কাজ কিন্তু বাইজী গড়া—খুব ডিগনিফায়েড প্রোফেসান, রেসপেকটেবল ও কালচারডও বটে। কোলকাতার জেনুইন গুণী মহলে এখনও অনেক কদর আছে, অনেকে চায়। ফরমাস মত গান শোন, নাচ দেখ, মদ খাও, চলে যাও। অনেকটা পথ ছাড়, জল খাও, হাত ধর, বাড়ি যাও গোছের, অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগটাই ভাল করে পড়, দ্বিতীয় ভাগ কদাচ পড়তে যেয়ো না। জটিলতায় ঢুকো না।

বেশী এগোলেই দমদম দাওয়াই।

বেলেল্লাগিরি করা পালান স্ট্যাণ্ড করতে পারে না। সেদিকে নিজেও খুব হিসেবী—পাকা ডিরেক্টার—মেপেজুপে এগোয় পেছোয়—কখনও লাগাম ছেড়ে দেয় না। কোনদিন দেয়ওনি। মুক্তিকে দিয়েই এতদিন চালিয়ে আসছে—আর তো চলে না—অন্তরায় তার মেদাধিক্য।

এখন আর আদর করে মুকুটি বলে না, বলে মুট্‌কি—বলে আর হাসে।

পালানের নজর আর একটাকে গড়ে পিটে যত শীগ্‌গির হয় কাজে নামানো। বিজনেস ইজ বিজনেস। আর্ট ফর আর্টস্ সেক—নোংরামির সেখানে ঠাঁই নাই। মেয়েছেলে আর ব্যাটাছেলে সবসময়েই খাদ্য খাদক সম্পর্কের নয়।

পালান এতদিন ধরে যা খুঁজছিল কাজলের মধ্যে নাকি তা সে পেয়েছে, ফিগারটা খুবই ভাল—চোখে লাগার মতন—হলেই বা রংটা একটু—পণ করেছে কাজলকে কাজলবাই করে সে তুলবেই—নয়তো—

ঘটনার দিনের কথা :—

রাত্রি তখন দশটা হবে—

দোকান সব বন্ধ হয়ে যাওয়াতে রাস্তাটা নিঝুমভাবে আলো-আঁধারি। কেবল ঘুঙুরের বোল দু-একটা বাড়ি থেকে ভেসে আসছিল আর মধ্যে মধ্যে শোনা যাচ্ছিল স্তাবকমণ্ডলীর উল্লাসিত স্তুতিবাদ। মধ্যে মধ্যে রিক্সাওলার ঘণ্টা দূর থেকে কাছে এসে আবার দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। দু-তিনজন সারেঙ্গীওলা তবলচি তখনও কল্ পাবার আশায় কিছু দূরে গুলতানি করছিল। একটা বেলফুলওলা হারাধনদের বাড়ির সামনে অপর দিকের ফুটপাথেতে দাঁড়িয়েছিল—হাতে ঝোলানো একগোছা মালা। ঘটনাস্থলের কাছাকাছিও কোথাও পুলিস ছিল না।

যোগজীবন ও জগন্নাথ একটা রিক্সায় পশ্চিম দিক থেকে পূবের দিকে যাচ্ছে—রিক্সাটা কাছে এসে পড়তেই পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে পালানকে ছুটে যেতে দেখা যায়।

পানের দোকান থেকে চকিতে তুলে নেওয়া একটা সোডার বোতল নিয়ে সেটাকে বাগিয়ে পালান ছুটে যেতে রিক্সাওলাটা থতমত খেয়ে যায়। প্রথমেই জগন্নাথ বাধা দিতে যায়—পালানের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি করে। জগন্নাথ প্রচুর টলছিল। পালানের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে বেহুঁস হয়ে যায়। হড় হড় করে রাস্তা বমিতে ভাসিয়ে দেয়। বোতলটা পালানের হাত থেকে পড়ে গিয়ে রাস্তায় চুরমার হয়ে যায়। পলকের মধ্যে পালান একটা ছুরি যোগজীবনের গলায় আমূল

বসিয়ে দেয় পাশ থেকে—ডিপ্ উণ্ড হ'তেই মরণোন্মুখ শিকার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত গঙ্গায় টলে পড়ে—পড়ে আবার ভাঙা কাঁচগুলির উপরেই।

পালান চকিতে পালিয়ে যায়—চটি একপাটি কেবল পড়ে থাকে।

মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যেতে যেতেই পথে যোগজীবন মারা যায়। এমারজেন্সীতে ডাক্তারের রিপোর্ট—হাসপাতালে পৌঁছবার আগেই মৃত্যু হয়েছে। গলায় একটাই ছুরিকাঘাত বটে—তাই যথেষ্ট—গভীর ক্ষত প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বালম্বি। নলিটা কেটে দু টুকরো হয়ে গেছে। পরে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে পাওয়া যায় ক্ষতের মধ্যে প্রচুর কাঁচের টুকরো—সারা অঙ্গে আরও তিনটি স্থানে ছোটখাটো কাটা ছেঁড়া ক্ষত।

পালান চকিতে পালিয়ে যায়—পাত্তা পাওয়া যায় না তখনকার মতন—স্থানীয় থানার ছোট দারোগা নিজে এনকোয়ারির ভার নিয়েছিল। প্রায় দেড় মাস পরে খড়্গপুরে পালান ধরা পড়ে।

প্রধান সাক্ষী—জগন্নাথ দেখেছে—পালান যোগজীবনকে ছুরি মেরেছে—জগন্নাথ বাধা দিতে গেলে পালান তাকে ঠেলে ফেলে দেয়। ফুলওলা পালানকে সনাক্ত করে—বলে, পালানকেই যোগজীবনের দিকে তেড়ে যেতে সে দেখেছে এবং সে আরও দেখেছে রাস্তায় বোতলভাঙা কাঁচের টুকরো ছড়ানো। সে সাক্ষী দেয় সামনের বাড়ির বারান্দাতে একজন লোক ও একটা মেয়ে পালানকে আঙুল দিয়ে কাকে যেন দেখিয়ে দেয়—পালান তখন তাদের পাশে ছিল। পানওলা সাক্ষী দেয় একঠো বাবু তুরন্ত আইসে একঠো সোডার বোতল লিয়ে ভেগে যায়—পালানকে কিন্তু সে সনাক্ত করতে পারেনি—বলেছে হোনে সেক্তা। তার আগের দিন থেকে সে দোকানে বসছে। রামবিলাস বাড়ি চলে গেছে দোকানটা তাকে ছ মাসের লীজ দিয়ে। ছোট দারোগা সাক্ষী দেয় পালানকে সে ভাল রকমই চেনে। দুশ্চরিত্র লম্পট ও এক নম্বরের ক্রিমিন্যাল। সে সব কবুল করেছে। মুক্তির কাছেই খবর পায় পালান খড়্গপুরে গেছে—বলেছে, কাজের ধান্দায় যাচ্ছি। মুক্তি বলেছে যে সে ছোট দারোগার ডিভোর্স করা বৌ—স্বামীর ক্রুয়েলটি ও অ্যাডালটারীর জন্য সে ডিভোর্স ডিক্রী পায়—পালানই এখন তার অন্নদাতা ও পরিত্রাতা।

ছোট দারোগাবাবু বলে, এ মুক্তি সে মুক্তি নয়—তার স্ত্রীও মুক্তি বটে তবে সে ডিভোর্স নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় পালিয়ে যায়; পরে সেখানে ফতিমাবিবি হয়ে ঘরসংসার করে। এখন বেঁচে আছে কিনা জানা নেই। পালানের ফেলে

যাওয়া একপাটি চটি মুক্তিই নাকি সনাক্ত করেছে। মুক্তি অস্বীকার করে।

ডিফেন্স্ কেস গড়া হয়েছিল আরও মোক্ষমভাবে—

ছোট দারোগা পার্সোন্যাল রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্যেই একটা ডাহা মিথ্যা কেসে পালানকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চায়। পালান নিরপরাধী। ঐ দিন ঐ সময়ে সে কাজলকে নিয়ে নাইট শোয়ে সিনেমা দেখতে যায়। দুখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিটের কাউন্টারফয়েলই তার প্রমাণ। মুক্তিকে ভয় দেখিয়ে সে প্রতিকূল স্টেটমেণ্ট দিতে বাধ্য করে। এ মুক্তি যে দারোগার মুক্তি নয়—মুক্তির বাবাকে ডাকা হ'ল না কেন—দর্জিপাড়ার রামহরিবাবু তো এখনও জীবিত।

জগন্নাথের এভিডেন্সের মূল্য কি? তার তখন কোন জ্ঞানগম্যিই ছিল না। কড়া নেশায় সে তখন বুঁদ হয়ে ছিল—তার বমিটার কালচারাল টেস্ট করালেই তো সেটা ধরা পড়ে যেত। টালিগঞ্জের যে দোকান থেকে সেদিন জগন্নাথ আর যোগজীবন মদ গিলেছিল হৈহুল্লোড় করেছিল, মাতলামো করেছিল, মারামারি করেছিল বলে বাবুলাল এভিডেন্স দিয়ে গেছে, তাকে ডিসবিলিভ কি ক'রে করা যায়! বাবুলাল দুবার ইলেকসানে হারলেও ও অঞ্চলের খানদানী লোক।

পানওলা পালানকে সনাক্ত করতে পারেনি—বলেছে হোনে সেকৃতা—একেবারে ভেগ্ টার্ম।

ফুলওলা কেবল পালানকে তেড়ে যেতে দেখেছে আর বোতলটা ভাঙতে দেখেছে—তার বেশী কিছু নয়।—মারতে দেখেনি।

রিক্সাওলাকে সাক্ষী ডাকা হয়নি—রিক্সার নম্বরও কেউ জানে না। রিক্সার গল্পটাই গট্‌আপ্ স্টোরি।

ফুলওলা বলার পরও হারাধন ও কাজলকে ডাকা হয়নি। কেন? যোগজীবন নিশ্চয়ই মাথা ঘুরে ঐ ভাঙা কাঁচের টুকরোর উপরই পড়েছিল সেইজন্যেই কাঁচের টুকরোয় গলা কাটা খুবই ন্যাচারাল। কিংবা এমনও হতে পারে গলার ক্ষতটা ও শরীরে আরও তিন জায়গায় যে কাটা ছেঁড়া পাওয়া গেছে, সবটাই টালিগঞ্জের মারামারির ফলে। অত্যধিক ব্লিডিং হওয়ার ফলেই যোগজীবন আর বেশীক্ষণ যুঝতে পারলে না—বাড়ির কাছে এসেই মারা গেল।

পালান কোনদিনই চটি পরত না। যখন ধরা পড়ে তখনও তার পায়ে পুরনো রবারের জুতো। পালানই যে খুনী কে দেখেছে—কোথায় তার প্রমাণ? তা ছাড়া কেন সে এমন কাজ করতে যাবে। ভাল ছেলে সে, কিছুটা লেখাপড়াও করেছে, খুন করার মোটিভ তার আসবে কেন? কোন কারণ নেই, কোন অনু-

প্রেরণা নেই। বিনা উদ্দেশ্যে কেউ কাউকে খুন করে কখনও? এমন একজন নিরপরাধ নির্দোষী সন্দেহাতীত লোকের জীবনমরণের প্রশ্নকে অতটা হাল্কা করে দেখা কি সুবিচার?

রায় বের হল—পালান রায় বেকসুর খালাস। বেনিফিট অফ ডাউটে।

বললেন অপূর্ববাবু, আমি কিন্তু মনে মনে বলেছিলুম—ঠাকুর, যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি। পালান পরে অবশ্য নিজেকে শুধরে নিয়েছিল। কাজলকে বিয়ে করে স্ত্রীর পদমর্যাদা দেয়। মোটামুটি চলনসই একটা কাজও জুটিয়ে নিয়ে ভদ্রভাবে থাকতেই সে চেয়েছিল। বাট্ নট্ অ্যালাওড্ বাই দি অল্‌মাইটি।

অপূর্ববাবু পাঁচ মিনিট বসে ছিলেন। বললেন, জানো, ফৌজদারী আইনে অ্যাকুইটালের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ বা খুব সূক্ষ্ম আইনের পয়েন্ট না থাকলে সাধারণত সরকারের পক্ষ থেকে আপীল করা হয় না। পালানের মামলা তো ফ্যাক্টের মামলা—আইন কতটুকু?

কিন্তু এক্ষেত্রে নিয়তিই নিজে আপীল করল পালানের বেকসুর খালাসের বিরুদ্ধে। ভগবান নিজেই কেসটা শুনলেন।

এবারের রায় হ'ল—ডেথ সেন্‌টেন্স্। আলটিমাম্ সাপ্রিসিয়াম।

শিববাবুকে ডাকতে গিয়েছিলাম।

বাড়ির বাইরে রকেতে একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে পা ঝুলিয়ে বসে তার প্লাস্টিকের মেয়েকে আদর করছিল।

বলি, খুকী, শিববাবু বাড়িতে আছেন? জবাব না পেয়ে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিও করি। দেখি আমার সম্ভাষণে অতটুকু ছোট মেয়ের ছোট ভুরুটুকুও যেন বেঁকে গেল—বলল, থিববাবু বললে কি ক'রে বুঝবো ব'ল? থিবথংকর না থিবকুঁয়ার, থিবনাত না থিব্রাম, সেটা বলবে তো?

থতমত খেয়ে গেলাম—বলি, শিববাবু বলেই তো জানি।

থাই জানো তুমি—কিন্তু জান না—কাকে চাও তুমি? জেঠুকে না বাপিকে, কাকামণিকে না মণিকাকে?

আমার উত্তর দিতে দেরী হচ্ছিল।

আবার বলল, ডাক্তারবাবুকে না উকীলবাবুকে? না যে বাবু অফিসে যায় না, যে বাবু কেবল তবলা বাজায়? তাকাই তো তাক্ দুম্—তেকে নেকে তাক্‌দুম্।

অন্ধকারে একটু যেন আলো পেলাম—বলি, যে বাবু অফিসে যায়—রেলের অফিসে।

বুদেছি—কাকামণিকে চাও তুমি—সে হ'ল থিবনাতবাবু, বোতো ডেকে দিচ্ছি—বলে চেঁচিয়ে ডাকল—এই থিবু, থেজবাবুকে ডেকে দে তো।

আমি বলি এ থিবু আবার কে?

মেয়েটি চেঁচিয়ে হেসে উঠলো—বলল, থিবু আমাদের চাকরের নাম—ভই'নক বোকা—ভাল দৈ একেবারে আনতে পারে না—টক্ বিষ দৈ আনে কেবল—মা খালি বকাবকি করে। বটা বেশ মিষ্টি দৈ আনে।

বুঝলাম এ থিবু ত বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ-দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক তার নেই।

যতক্ষণ না শিবনাথবাবু আসেন মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জমাতে লোভ হল। এতে রাজনীতি নেই, তেজীমন্দি নেই, খাদ্য সমস্যা নেই, ফ্যামিলি প্ল্যানিং নেই, পাস ফেল নেই, ঘেরাও-বন্ধ্ নেই বা খুনোখুনী-কারফু নেই—তাই ভাল লাগে।

বলি, আচ্ছা তোমাদের বাড়িতে তো দেখছি শিবের ছড়াছড়ি, তা তুমি কি লক্ষ্মী না সরস্বতী ?

দূর, তা কেন, আমার ভাল নাম তিলোত্তমা, ডাকনাম চিংড়ী।

আমি বলি, তিলোত্তমা, নামটাও তো খুব গ্র্যাণ্ড দেখছি, তবে একটু বড়সড়, আর বানানটাও তো বেশ শক্ত, তাই না ?

মেয়েটি বলল, তুমি কিছু পড়াশোনা কর না বুঝি ? বানানটা হচ্ছে —ত'য়ে আকার ল'য়ে আকার—তিলো ত'য়ে আকার ম'য়ে আকার—ত্তমা—তিলোত্তমা।

যে মেয়েটি আকারের গণ্ডী এখনও ছাড়ায়নি তার বয়সটি এ থেকেই অনুমিত হয়।

॥ ৪৪ ॥

ছুটির দিনে বিশ্রম্ভালাপ।

ঘরে বসে গল্পগুজব করছিলাম, শ্যালিকা ও শালিপতিভাই বেড়াতে এলেন। আড্ডা পুরোপুরি জমে উঠল। একথা সেকথার পরে বোন বোনকে বলে, যাই ব'ল ভাই আমাদের নরেনবাবু কিন্তু মহাদেবের মতন। কাজে ক্লান্তি নেই কথায় ভ্রান্তি নেই শরীরে অবসাদ নেই মুখে ব্যাজার নেই। সংসারের সব কাজ বাজিয়ে কারবারের সব ঝামেলা সামলিয়ে সন্ধ্যায় হয় ছেলেকে পড়াতে বসানো নয়তো মেয়েকে গান শেখানো—কম বাহাদুরীর কথা? আর আমারটি? খালি হুস হুস ক'রে সিগারেট খেয়ে আর রাজা উজীর মেরেই জীবন কাটিয়ে দিলেন—বাপের টাকা ছিল—মানিয়ে গেল—বুঝবে বাবু কলসীর জল ফুরোলে।

বলে রাখি নরেনবাবু বলতে আমাকে বোঝায়।

অর্ধাঙ্গিনী সেলাইয়ের কল চালাচ্ছিলেন। থামিয়ে বলেন, বাহাদুরীর কথা বললি তো বল্ বাহাদুরীটা এই বাহাদুরের—এই শর্মার—বলে নিজের দিকে আঙুল দেখালেন—বলি সমানে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে কে? এই যে লোকে বলে, রেলে ষোল ঘণ্টায় দিল্লী যাচ্ছে—রেলের গালভরা নাম রাজধানী এক্স-প্রেস—কেমন? আরে বোকা রেলের তাতে কি কৃতিত্ব—কৃতিত্ব তো ইঞ্জিনের—আমিই তো সেই শক্তি—তা কি বুঝিস—আমিই সেই ইঞ্জিন—আমাকে ডিজেলই বল্ ক্যানাডিয়ানই বল্ আর বৈদ্যুতিকই বল্—এখন বুঝলি? শালী ও শালীপতিভাই পরস্পর নির্বাক অবস্থায় মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন—যেন হবেও বা হ'লেও হ'তে পারে হয়তো।

আমি খবরের কাগজ দেখছিলাম—কাগজেই মুখ ঢেকে বললাম, তা আমি নামক রেলের শক্তিদাত্রী ইঞ্জিনটাকে সত্যিকারের ইঞ্জিনের মতন খানিকটা খানিকটা অন্তর বদলালে কেমন হয়?

অতিথিদ্বয়ের বিকট হাসির শব্দ চাপার জন্যই বোধহয় গৃহিণী পুনরায় সশব্দে কল চালাতে শুরু করলেন।

॥ ৪৫ ॥

পাশাপাশি দুজনের অফিস।

মিস্টার বিরাট বরাট আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। জীবনেও আমাদের একই পেশা। মিস্টার বিরাট বরাট ; যেমন বিরাট বপু তেমনি বিরাট বধির। তবে সম্প্রতি ভেলোরে গিয়ে কান কাটিয়ে গত সপ্তাহে ফিরেছে।

সেদিন একরাশ পুরোনো খাস্তা দলিল দস্তাবেজ টেবিলে বিছিয়ে একটা সম্পত্তির টাইটেল উদ্ধার করছিলাম। হঠাৎ স্প্রিং ডোর ঠেলে বরাট সাহেবের প্রবেশ করাতে মনে মনে কিঞ্চিৎ বিরক্তি বোধ করলাম। কিছু প্রকাশ করলাম না বটে তবে কখন নিজের অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল—কালা শালা আবার এখন অসময়ে জ্বালাতে এলো কেন? আর সময় পেলে না?

মিস্টার বরাট নিজের কানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, আমি এখন শুনতে পাই।

নিজেকে সামলিয়ে বলি, হ্যাঁ তা আর হবে না? ওখানকার সার্জারীই আলাদা—শুনেছি তো কি ব্যবস্থা? কি বন্দোবস্ত? আমরা এখানে ভাবতেই পারি না। আর টাকাও নেয় তেমনি।

বরাট সাহেব বলে, তা যাক্—খরচ করাটা সার্থক হয়—তুমি আমায় দেখে প্রথমেই যা বলে উঠলে এতদূর থেকেও পরিষ্কার তা শুনতে পেয়েছি—বলে মাথা হেলাল।

আমি বলি, হ্যাঁ তাই তো বললুম—তালা ফালা সব দিয়ে এলে তো? ভোলা শালা সেদিন আমার টেবিল থেকে সেফার্স পেনটা চক্ষুদান করলে। ক্লেপটোমেনিয়ার ক্রীচার তো? ভোলা গো ; গোলার ভাইটা।

মিস্টার বরাট থমকাল—ঢোক গিলল—মনে করল—তার শুনতে কি তবে ভুল হ'ল নাকি?

কুশলাদি প্রশ্নের পরে বলি, মালা মেলা খেলা হেলা ফেলার খবর সব ভাল তো? যাব একদিন—ধীরেসুস্থে বসে কান কাটানোর গল্প শুনবো আর কফি খেয়ে আসবো—মেয়েরা কফিটা যা ক'রে, না!—অপূর্ব! তোমার পাঁচটা মেয়ে পাঁচটা রত্ন।

ওষুধ ধরলো, বন্ধু নিঃসন্দেহ হ'ল, মেঘ কেটে গেল, মুখে হাসি ফুটলো আর আমিও বাঁচলুম।

সরল খস খস ক'রে লিখে যাচ্ছিল—

সম্পাদকেদের ফরমাইসে—সামনে পূজাসংখ্যা বেরুবার তীব্র প্রতিযোগিতা। রেখা হলুদ-বাটা হাতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, ওগো শুনছো—পঞ্চানন পালের দোকানে তেল দিচ্ছে—যাও না একবার টিনটা নিয়ে।

সরল বলে, এ পৃথিবীতে আমায় তো কেউ কখনও তেল দেয়নি। ওসব বাজে কথা ছাড়, তার চেয়ে একটা কাজের কথা বলি শোন—বলছিলাম কি আমি তোমায় ভালবাসি।

রেখা ভ্রু কুঞ্চিত করে বলে, হঠাৎ? কি মতলবে? এক পেয়ালা কফি, না গেঞ্জীতে সাবান না মতির মাকে দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট আনিয়ে দেবো?

সরল বলে, আরে না না—আমি যে তোমায় ভালবাসি বিশ্বাস হ'ল না? যে সে ভালবাসা নয় গো? মানে একেবারে যাকে বলে পাকা সোনা—ছ' পয়সার খাদ পর্যন্ত নেই তাতে।

রেখা সহজে মানতে রাজী নয়—ঢোক গিলে বলে, না হয় ধরো মানলুম—কিন্তু বল তো দশ বছর আগে না আজকে এই মুহূর্তে নাকি দশ বছর বাদেও? কোন্ কালে?

সরল বলে, তিন কালেই—জন্মজন্মান্তরে তুমি যেন আমার কি বলবো? তুমি আমার—বলি?

রেখা বলে, চট্‌পট্ বলে ফেলো না। ওদিকে ডাল পুড়ে যাচ্ছে যে।

সরল বলে, মনে হচ্ছে যেন তুমি আমার—কি বল্‌বো? বলি?

রেখা বলে, বলোই না কেন?

বলবো?

দূর ছাই।

বলি?

বলবে তো ব'ল, না হয় তো চলি।

বলেই ফেলি তবে—অ্যাঁ?

হ্যাঁ, বলেই ফেলো তবে—হ্যাঁ।

শোন বলছি।

শুনি বলো।

তুমি হ'চ্ছ আমার—

শৈশবের—খুকৃতু।

বাল্যের—ঢেম্‌লী।

কৈশোরের—চিংড়ী।

যৌবনের—মনীষা।

প্রৌঢ়ত্বের—নিরুপমা।

বার্ধক্যের—বিশ্বেশ্বরী।

স্থবিরত্যের—ক্ষেমংকরী।

তখনকার মতন যে সাতটা গল্প সরল ফেঁদেছিল তাদের সব নায়িকাগুলির নামই গড়গড় করে বলে গেল। রেখার ভুরু বেঁকে গেল—বলে, এই ঢংরং করবার জন্যেই কি সাতসকালে তুমি আমায় এতক্ষণ জ্বালালে? এই জন্যেই পুরুষ জাতকে আমরা বিশ্বাস করি না—তারা নিজের নিজের নিয়ে খুশী থাকতে পারে না—একটা মেয়ের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এক নিঃশ্বাসে কতগুলো মেয়ের নাম মুখ দিয়ে আপসে বেরিয়ে গেল দেখলে? তবু জ্বরজারিতে নয় যে বুঝবো ভুল বকছে—দিব্যি ঠাণ্ডা মাথায় হেসে হেসে কেমন বলে গেলে রাজ্যের মেয়েছেলের নাম। আমার বাপ-মায়ের অনেক জন্মের পাপ ছিল তাই তোমার হাতে পড়েছি।

পরিবার পরিকল্পনা

পরিবার শব্দটি যখন একবচনে ব্যবহৃত হয় তখন মানে হয় স্ত্রী—যেমন বলি বটুকবাবুর পরিবার গলায় দড়ি দিয়েছেন।

ঐ পরিবার শব্দটি যখন দ্বিবচনে ব্যবহার করি তখন আমরা বোঝাতে চাই স্বামী স্ত্রী যুগলে—দম্পতি জম্পতি জায়াপতি; যখন সব ঋতুই বসন্ত কাল, যখন সকল সময়েই আলো-ঝলমল পূর্ণিমারই জোছনা রাতের কথা মনে পড়িয়ে দেয়; যখন পূবের রোদে ঘর ভেসে গেলেও আমরা বলি রজনী এখনো বাকী। এরূপ দ্বিবচনে পরিবারের পরিকল্পনার কথা স্বামী স্ত্রীই বলতে পারেন—সেখানে তোমার আর আমার জীবনের খেলাঘরে তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলাতে পারেন না।

পরিবার শব্দের বহু বচনের অর্থ দাঁড়ায় স্বামী স্ত্রী প্লাস পটলা অটলা বংকা মংকা অধর শ্রীধর কালি ডালি সোনা ভোনা পোকা বোকা আন্না এবং বাচ্চু।

এ হেন বহুবচনে পরিবারের পরিকল্পনার কথা সদাসর্বদা আমরা রেডিয়োতে শুনি, ট্রামে বাসে বিজ্ঞাপন দেখি—খবরের কাগজে পড়ি—ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে পারি না—থতমত খাই।

সরকারের পরিবার পরিকল্পনার কথা বলতে পরিবারকে পরিষ্কার ভাবে কল্পনা করার কথাই বোঝায়—কিন্তু কেউ বোঝে কেউ না বোঝে—কিন্তু কান্তিবাবু বোঝেননি।

কান্তিবাবুর শান্তি নেই। দেখা করতে গিয়ে দেখলাম বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ—বাইরে থেকেই শুনতে পেলাম কান্তিবাবু কাকে শাসন করছেন—কেন গেছলি বল্ শিগ্‌গীর, বল্ কে বলেছিলো যেতে? আই উইল কিল্ ইউ, কিল্ ইউ সারটেন্‌লি—বল্ আর যাবি? কখনও যাবি? মনে থাকবে? স্টুপিড ইতর লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা গাধা শূয়ার কি বাচ্ছা—

আরও শুনতে পেলাম একটি শিশু প্রহৃত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করছে। কান্তিবাবুর চিৎকার আর শিশুর তারস্বরে ক্রন্দন এক দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টিকরেছে—একটা অপাচ্য সংমিশ্রণ। ভাবি ছেলে শূয়ার কি বাচ্ছা হ'লে বাবা কি হয়?

বাড়িতে আছেন জেনেই জিজ্ঞাসা করলাম, কান্তিবাবু বাড়ি আছেন?

কান্তিবাবু বেরিয়ে এলে বলি, কি খবর ? সকালেই এত গোলমাল কিসের ?

জবাব হ'ল, আর বলবেন না মশায়—জ্বলে পুড়ে মলুম। তিন বছরের ছেলে মশায় সাতটা ভাইয়ের কান কাটে। সাধে লোকেবলে অষ্টম গর্ভ একটি চিজ্ !

বলি, কি রকম ?

সারাদিন মশায় সদর দরজা বন্ধ থাকে—সবে মাত্তর চিঠি ডাকে দিতে গেছি কখন ঠিক পিছু পিছু বেরিয়ে গেছে কে জানে! দেখি সেই মোড়ে দাঁড়িয়ে আঙুল চুষছে। গাড়ি ঘোড়া বাস ট্রাম ট্যাক্সি টেম্পো রিক্সা ঠেলাগাড়ি কিসের অভাব মশায় কলকাতায়। একদণ্ড শান্তি নেই মশায়—দু মিনিট বাইরে গিয়েও জ্বালা। মানুষের মাথার পেছনে তো চোখ নেই।

মুখে বলি, সত্যিই তো—

মনে মনে ভাবি, তিন বছরের একটি শিশুর প্রতি এত কঠোর শাসনপদ্ধতি অবলম্বন না করে শান্তিপ্রিয় কান্তিবাবু যদি তিন বছর দশ মাস পূর্বে শাসনের অন্য পদ্ধতি কিছুটা ভাবতেন তাহ'লে বোধ হয় আজ তিনি প্রকৃত শান্তি কতকটা পেতেন। অন্তত ব্লাড প্রেসারটাও বাড়তো না, স্ট্রোকের ভয়ও কমে যেতো।

সরকার তো বহু বছর ধরেই বারে বারে নন্‌ষ্টপ্ বলে আসছেন—আপনার পরিবারকে পরিষ্কার ভাবে—কল্পনা করতে শিখুন।

দুঃখের কথা এই যে শোনে ক'জনে ?

সকলেই তো কান্তিবাবুর মতন এ পৃথিবীতে অশান্তি বাড়িয়ে যাচ্ছেন—বললে বলবেন সংবিধানে ওটা আমাদের মৌলিক অধিকার।

ও প্রাইভেসীতে হস্তক্ষেপ করা চলছে না চলবে না।

মাত্র দু দিনের ব্যবধান।

· কাঁসারী পাড়ায় রামায়ণ গান শুনতে গিয়েছিলাম—খুব ঘটা পটা করেছিল। নিয়মমাফিক সভাপতি প্রধান অতিথিও বাদ যায়নি।

সভাপতিকে দেখেই চিনতে পারলাম, সেই ভদ্রলোকই মাত্র দু দিন পূর্বে শাঁখারীটোলায় নারীঘটিত একটা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

আলাপ করে হেসে বললাম, কি ব্যাপার একেবারে নারীহরণ থেকে রামায়ণে?

ভদ্রলোক হাসলেন—বললেন, অ্যালায়েড ম্যাটার তো? তবে সেটা নারীহরণ সমিতি নয়, নারীহরণ উদ্ধার সমিতি।

বললাম, তা না হয় হ'ল—কিন্তু "উদ্ধার" শব্দ যোগ করলেও তো আপনার সেই একই উত্তর হবে—নারী হরণ উদ্ধার ও রামায়ণ গান অ্যালায়েড ম্যাটার তো। উদ্ধার করলে কৌলীন্য কিছুটা বাড়লো—এই যা।

ভদ্রলোক স্মিত হাস্যে মাথা নাড়লেন—বললেন, আমি হচ্ছি একজন সি গ্রেডের সভাপতি এবং আশুতোষ। এক কাপ চা একটা গাঁদা ফুলের মালা প্লাস—বলে বাঁ হাতের পাঁচটি আঙুল গোপনে দেখালেন। পরে বললেন, কিন্তু স্যার, আমিও যদি এখন আপনাকে সেই একই প্রশ্ন করি—কি ব্যাপার একেবারে নারী হরণ থেকে রামায়ণে? আমি তো প্রোফেসানাল সভাপতি, আপনি কি?

আমার উত্তর হল, বর্তমানে আমিও প্রোফেসানাল অডিয়েন্স। চাকরি থেকে রিটায়ার্ড করার পর সকাল বিকাল হেথা হোথা সেথা ঘুরে বেড়াই। বড় ছেলে ট্রামের টিকিট কিনে দিয়েছে। ছোট ছেলে ডাক্তার—বলে, অ্যাকটিভ্ হ্যাবিট রাখতে—শরীরটাকে ফিট রাখতে—ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে—ভোরে গঙ্গা-স্নান করতে। চা সিগ্রেট কমিয়ে দিয়েছি তবে ছাড়িনি—নেশার জিনিস তো—ডায়েটটা কণ্ট্রোল করে দিয়েছি—আছিও ভাল। সদা সর্বদা হালকা মনে ঘুরে বেড়াই। রাজনীতি করি না। অন্য নিরামিষ সভাসমিতিতে একটু-আধটু যাই বটে তবে সমঝদার হিসাবে আমিও সি গ্রেডের।

আগে যখন-তখন হাততালি দিতুম—সেম্ সেম্ বলতুম—দু-একবার ভুল চাল দেওয়ার পরে এখন পাশের লোকেদের ভাল করে ফলো করি।

পথে যেতে যেতে দেখি—

একটা পাঁচিলের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—কালো ব্যাক গ্রাউণ্ডে সাদা লেখা—এই যে শালা—তার নীচে ছোট ক'রে লেখা—'ভিতরে'—

একবার দুবার তিনবার লেখাটি পড়ে একাধারে বিরক্ত-বিস্মিত ও অনিসন্ধিৎসু হলাম। পাঁচিলের আড়ালেই দেখি একটি দোকানে জন চার-পাঁচ লোক কাপড়-চোপড় রং রিপু ও ধোলাই করছে। বুঝি, শালকরের দোকান।

যুগপৎ প্রশ্ন হল, কি চাই স্যার? বলুন? আসুন।

বললাম, পাবলিকের সামনে এ রকম ওপোন্‌লি অসভ্য ভাবে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কেন? এটা কি আপনাদের কোন আর্ট অফ পাবলিসিটি? কাছেই বাচ্চাদের ইস্কুল—চারদিকে ভদ্র বসতি—পাড়ার মধ্যে এ কি অসভ্যতা আপনাদের?

কাশতে কাশতে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে বললেন, বাইরে গিয়ে দ্যাখ তো মফিজ—আবার বোধহয় শালারা—

পরেই দেখি বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি নিজেই একটা ভিজে কাপড় হাতে করে বাইরে এসে পাঁচিলের গায়ে লেখা ল'য়ের আকারের খড়ি দিয়ে নিপুণ ভাবে লেখা আকারটি মুছে দিতে দিতে বলেন, ধরতে পারি না শালাকে—বলে পুনরায় কাশতে লাগলেন—কোন্ শালার কাজ—মনে হয় সামনের ঐ শালা—আমার খদ্দেরকে চটিয়ে ভাঙাবার মতলব—যেদিন ধরতে পারবো…

ট্রেড রাইভালরির এরূপ নবতম পন্থা ইতিপূর্বে দেখিনি।

দোকানের বাইরে এলে ওদিকের দোকানের মালিক সামনে নমস্কার করে দাঁড়ালেন—বললেন, অন্য কিছু ভাববেন না স্যার—শুধু চাচার ঐ মুদ্রা দোষটাকে ছাড়াতে পারি কিনা পরখ করছি ক' দিন থেকে। চাচার খদ্দের ভাঙাবার কু-মতলব কোন কিছু আমার নেই—নিছক রসিকতা বলা যায়। পড়তে পারে এমন পথের ছেলের নজরে যখনই ঐ লেখাটা পড়ে তখনই তার গলা দিয়ে ঐ কথাটা অজ্ঞাতসারেই নিজে নিজে বেরিয়ে যায় আর চাচা গোসা করেন যেন তাঁকেই ছেলেরা নকল করছে।

পথচারীকে শালের দোকানের নির্দেশ দিতে কি বিড়ম্বনা?

বর্ষায় তেলেভাজা অমৃত সমান—

শ্যামসুন্দরকে তেলেভাজা কিনতে দিয়েছিল অনেকক্ষণ—এদিকে চা জুড়িয়ে প্রায় সরবতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে—সুন্দর আর ফেরে না—দেরীর কারণ হঠাৎ বৃষ্টি। একটু বেগটা কমতেই সুন্দর এসে পৌঁছায়। নিজে ভিজে কাক হয়েছে বটে তবে গরম তেলেভাজাকে খুবই বাঁচিয়েছে—তখনও বেশ গরম। একটাতে কামড় দিয়ে পরম তৃপ্তিতে শ্যাম চোখ বুজিয়ে বলে, একেবারে ভিজে গেছিস না রে? বৃষ্টি এলো দেখলি তো কোথাও দাঁড়ালি না কেন? একটু পরেই না হয় কিন্‌তিস্।

সুন্দর বলে, আগেই কিনে ফেলেছিলুম—একটা খাবারের দোকানে খানিকটা দাঁড়ালুম—বৃষ্টি থামলো না; তবে কমে এলো। কতক্ষণ দাঁড়াবো ব'ল—তাই ভিজেই চলে এলুম।

কারোর ছাতায় এলি না কেন?

হ্যাঁ তুমিও যেমন—কে ছাতা দিচ্ছে—ছাতা কেনা আর মেরামতের যা দর—কে ছাতা নিচ্ছেই বা?

তুই বড্ড বোকা তো? যে কোন ছাতাওলা একটা লোককে উদ্দেশ্য ক'রে বল্‌লি না কেন—কি বেআক্কেলে দোকানদারটা দেখুন স্যার? আজ সাত দিন ধরে চিনি দিন চিনি দিন, ব্যবসা করতে পারছি না বলে বাড়ির চৌকাঠ খইয়ে দিলে আর আজ যেই একমণ চিনি মশায় কণ্ট্রোল দরে দিতে এলুম—বলে কিনা নেবো না—ব্যবসা চলছে না—সাতশো ফিরিস্তি। কম কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে ভাবছেন? কি ফল্‌স্ পোজিসনে পড়লুম বলুন তো? আমিই বা চিনি নিয়ে করি কি? থাকি মেসে, চা খাই দোকানে।

তা হ'লে কি হতো?

দেখতিস নিজে ভিজেও তোর মাথায় ছাতা ধরে সারা কলকাতার শহর ঘুরিয়ে আনবার লোকের অভাব হ'ত না।

ঘোর ঘোটের কলা—

ঘোর ঘোটের কলা—রাস্তা দিয়ে দূরে ফেরিওয়ালা হেঁকে চলে যাচ্ছে।

দশ বছরের আমি দু মাস টায়ফয়েডে ভুগে রাণাঘাটে পিসিমার বাড়ি হাওয়া বদলাতে এসে বাইরের ঘরে জানলার ধারে চুপটি ক'রে বসেছিলুম।

ফেরীওয়ালা আরও কাছ দিয়ে যেতে যেতে হাঁকছিল—"ঘোর ঘোটের কলা, ঘোর ঘোটের কলা"।

রুগ্ন দেহের লোভাতুর মনে বুভুক্ষা দেখা দিল। ফেরীওয়ালাকে ডাকলুম এবং ডাকবামাত্র একটি পুঁটলী নিয়ে সে দাওয়ায় এসে বসল।

দাদা বলল, কৈ দেখি, কি আছে তোমার?

লোকটি বলল, আট গণ্ডা পয়সা লাগবে বাবু।

দাদা বলল, দেখাও তো আগে।

লোকটি বলল, একটু তেল ঢ্যান্ কর্তা আর কুয়োতলাটা কোথায় ক'ন?

জিজ্ঞাসু নেত্রে আমরা চেয়ে রইলুম।

লোকটি পরিষ্কার করে বলল, কুয়োতে যে আপনাদের ঘটি পড়েছে বললেন—সে কুয়োতলাটা কোথায়? ভিতরে নাববো একটু তেল চাই তো—গায়ে মাখবো না?

আমরা বললুম, আমাদের কুয়ো নেই—টেপা কল।

প্রয়োজন নেই শুনে লোকটি চলে গেল, যাবার সময় আবার হাঁকতে হাঁকতে স্বরটা ক্রমশ মিলিয়ে যেতে লাগছিল বটে কিন্তু তখন বেশ বুঝতে পারলুম, সে ডেকে বলছে "কুয়োর ঘটি তোলা, কুয়োর ঘটি তোলা।"